শ্রীচৈতন্য ঃ জীবন-সাহিত্য-দর্শন

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ সম্পাদিত

সম্পাদকীয়—

হিরণ্যদ্যুতি সন্ন্যাসী তথা সমাজবিপ্লবী মহানায়ক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা যা নবজাগরণের দ্যোতক। সমাজ-রাষ্ট্র-সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান আজ পঞ্চশতবর্ষ পরেও পারিজাত পুষ্প-প্রায় অম্লান। সেই দিব্যজীবন জাতির জীবনে স্মরণ ও মননে সদাজাগ্রত থাকুক--এই অভীপ্সাই বক্ষ্যমান গ্রন্থের জন্মলগ্নে বিদ্যমান। 'মালদহ জিলা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশত জন্মজয়ন্তী মহোৎসব কমিটি' এ দীন সংকলকের উপর যে গুরুভার অর্পণ করেছিলেন, তা আংশিক সফল হলে অধম হবে কৃতার্থ!

প্রাসঙ্গিকভাবে জানাই যে প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন সময়ে আসায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে তার কৌলিন্য রক্ষিত হওয়া যে দুরূহ — তা সুধীব্যক্তি স্বীকার করলে বাধিত হব।

এ গ্রন্থের বিদগ্ধ গবেষক-লেখকদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। কতিপয় প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটির নিকট। প্রকাশনে সহযোগিতার উদার-হস্ত প্রসারণে কমিটির সম্পাদক শ্রীপঙ্কজকুমার পোদ্দারকে জানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। আর যাঁদের সহযোগিতা উল্লেখ্য -- তাঁরা হলেন অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক ধ্রুবরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীসন্তোষকুমার নাথ, শ্রীভবানীকুমার চক্রবর্তী, শ্রীদুলালচন্দ্র নাথ বন্ধুবর বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও মুদ্রক শ্রীমান সুরজিৎ চক্রবর্তী। প্রেস কপি প্রণয়নের জন্য ছাত্রী শ্রীমতী স্বাতী কুণ্ডু ও ছাত্র শ্রীমান সুধীর দাস-কে জানাই আশীর্বাদ।

সুদূর মহানগরী কলকাতায় দ্রুতমুদ্রণে যে সামান্য ত্রুটি — তার জন্য ভক্ত-জ্ঞানীর করুণা ভিক্ষা করি! পরিশেষে জানাই — মহাপ্রভুর অনালোকিত সামান্য রূপ এ গ্রন্থে প্রকাশিত হলেই এর চরম সার্থকতা ও পরম পুরস্কার।

মালদহ, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৯২ ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ

সূচীপত্র

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥

(যিনি রথের সম্মুখভাগে নৃত্য করিয়াছিলেন, যাঁহার নৃত্য দেখিয়া নিখিল-জগতের বিস্ময় জন্মিয়াছিল এবং স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জয়যুক্ত হউন)

ত্রয়োদশ/মধ্যলীলা
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দাক্ষিণাত্য প্রভাব

কবিশেখর কালিদাস রায়

ভক্তিমার্গীয় সাধনার জন্মই দাক্ষিণাপথে। আর্যাবর্তের আর্যগণ জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গেরই পক্ষপাতী ছিলেন। বৈদিক ধর্মের প্রভাবে আর্যাবর্তে স্মার্তধর্মেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। কর্মকাণ্ড প্রবল হইয়া ক্রমে জ্ঞানকাণ্ডকেও গ্রাস করিয়াছিল। আর্যাবর্তের ধর্ম ক্রমে যাগযজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান ও বহু দেবদেবীর শাস্ত্রসম্মত উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে বৈদিক কর্মকাণ্ড নিস্প্রভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নূতন কর্মকাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল। দশশীলসম্মত নৈতিক সদাচরণই বৌদ্ধ মতের ধর্মসাধনা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতনে নানাপ্রকার তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর সাধনা ও নানাপ্রকার আত্মনিগ্রহের দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার জন্য যে সকল যোগীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং অনেকে তদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভও করিতেন--- তাঁহারাই সাধারণ লোকের উপাস্য ও গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধমতের প্রভাবে একপ্রকার বৌদ্ধসহজিয়া-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল---এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু স্মার্তদের মিলনে একপ্রকার তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল।

ইঁহারা সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মজীবনের সর্বপ্রকার সংস্কার হইতে মুক্তি লাভকেই নির্বাণলাভের উপায় ও সহজ আনন্দ উপভোগকে মুক্তিজনিত মহাসুখবাদ বলিয়া ঘোষণা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য এবং অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাপথে জ্ঞানমার্গের যে প্রাধান্য হয় নাই তাহা নহে---শংকরাচার্যই দাক্ষিণাপথে জন্মিয়া ছিলেন। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানও দাক্ষিণাপথে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজিও সে দেশে স্মার্ত ও শাক্ত, শৈব ও পঞ্চোপাসক লোকের অভাব নাই। তামিল নাইডু ব্রাহ্মণরা আজিও অক্ষরে অক্ষরে বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসরণ করেন। বৌদ্ধপ্রভাব দাক্ষিণাপথে পূর্ণরূপে পতিত হয় নাই। দাক্ষিণাপথে সকল প্রকার ধর্মসাধনাই অবাধ প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত সাধনাকে ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ভক্তিধর্ম। যে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ভক্তিধর্মের বেদ---তাহা দাক্ষিণাপথেই রচিত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। জ্ঞানমার্গ যেমন আর্যদের নিজস্ব, ভক্তিমার্গ তেমনি দ্রাবিড় জাতির নিজস্ব মূল ধর্ম। কালক্রমে আর্যগণ দ্রাবির-ভক্তিধর্মের দ্বারা দ্রাবিড়গণ আর্য জ্ঞানধর্মের দ্বারা অল্প বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন।

প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আলোয়ার নামক এক শ্রেণীর সাধক জন্মিয়া ছিলেন। ইঁহারা তাম্রপর্ণী, পয়স্বিনী, কৃষ্ণবেম্বা ইত্যাদি নদীর কূলে বাস করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বৈষ্ণবসাধকদের উল্লেখ আছে—তাঁহারাই ইঁহারা। ইঁহারা কেবল ভক্তিমার্গের সাধকমাত্র ছিলেন না, ইঁহারা ভক্তিরসকে মধুর বা উজ্জ্বল রসে পরিণত করিয়া ভক্তিমার্গের চরম লক্ষ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে মধুর ভাবের সাধনা গৌড়বঙ্গে প্রচার করিয়াছেন—ইঁহারা অতি প্রাচীনকালেই তাহা অধিগত করিয়াছিলেন। তামিল ভাষায় ইঁহাদের যে রসসাহিত্য আছে—তাহা পাঠে দেখা যায় ইঁহারা ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মাকে নায়িকা রূপে কল্পনা করিয়া মধুর রসের সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সাহিত্য তামিল ভাষায় রচিত বলিয়া আর্যাবর্তে তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। ইঁহারা যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সময়ে দাক্ষিণাপথে বৈদিক ও স্মার্তধর্মের বড়ই প্রভাব—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই শৈব। ইঁহারা নীচ দ্রাবিড় জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় ব্রাহ্মণ্যসমাজ ইঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করেন নাই---কিন্তু অব্রাহ্মণ্য সমাজ ইঁহাদিগকে অবতার বলিয়া মনে করিয়া ইঁহাদের ধর্ম-অনুসরণ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যসমাজ ইঁহাদের রসসাধনার ধর্ম গ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণ্য-সমাজের উপর ইঁহার প্রভাবসম্পাত হইয়াছিল। বেদবেদান্তের সহিত ভক্তিসাধনার সামঞ্জস্য-সাধন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিধর্মের সামঞ্জস্য মিলনেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের সৃষ্টি। আলোয়ারদের তামিল ভাষায় রচিত রসসাহিত্যের সংস্কৃতে অনুবাদ হইয়াছিল এবং সংস্কৃতে আভিজাত্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজেও সমাদৃত হইয়াছিল।

ঐ আলোয়ার সাধকগণের মধ্যে শঠকোপ ছিলেন অগ্রগণ্য। পঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত সম্প্রদায়ের শ্রীরঙ্গাচার্য বা নাথমুনি নামে একজন সাধক খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিচিনপল্লীর নিকটে ধর্মপ্রচার করিতেন। ইনিই শঠকোপের ভক্তিরসাত্মক রচনায় বিমুগ্ধ হইয়া আলোয়ার সাধকদের সমস্ত রচনা সংগ্রহ করেন,—শঠকোপের বৈষ্ণবদর্শন বা দ্রাবিড়বেদকে আর্যসমাজে প্রচার করেন এবং ইঁহারই চেষ্টাতেই আলোয়ারদের স্তোত্রাবলী শ্রীরঙ্গমে শ্রীমূর্তির সম্মুখে আবৃত্ত ও গীত হইতে থাকে। এই নাথমুনির পুত্র ঈশ্বর মুনি -ঈশ্বর মুনির পুত্র যামুনাচার্য। ইনি দাক্ষিণাপথে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই যামুনাচার্যের শিষ্য শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামানুজ।

এই যামুনাচার্যই শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ভগবানের চিদ্‌বিগ্রহত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যামুনাচার্য হইতেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উৎপত্তি। ইঁহার উপর আলোয়ার সাধকগণের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। সেজন্য ইনি কেবল বৈধী ভক্তি নয় রাগানুগা ভক্তিরও প্রচারক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের সঙ্গে তাঁহার ভক্তিধর্মের মিল ছিল বলিয়াই রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে, জীব গোস্বামী ষট্‌ সন্দর্ভে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার স্তোত্রাবলী স্ব স্ব রসধর্মের পোষকতার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামানুজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মান্দ্রাজের চেঙ্গপৎ জেলায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজ শৈব ব্রাহ্মণসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদান্তিক পণ্ডিত যাদব প্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তিনি মায়াবাদে আস্থা রাখিতে পারেন নাই। কেবল তিনি বৈষ্ণব যামুনাচার্যের শিষ্য ছিলেন বলিয়া নয়—তাঁহার গুরুভাই কাঞ্চীপূর্ণের পূর্ণ প্রভাবও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। এই কাঞ্চীপূর্ণ হীন দ্রাবিড়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সে সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, শঠকোপের রচিত শঠারিসূত্র তাঁহার ধর্মমতের আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। রামানুজ শঙ্করের ব্রহ্মকে ভক্তের ভগবান করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়, তাঁহার রচিত বেদান্তভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। এই শ্রীভাষ্যে তিনি অপ্রাকৃত রূপগুণযুক্ত অদ্বৈত ঈশ্বরকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিদানস্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁহার দার্শনিক মতকে তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। বেদান্তের সহিত ভক্তিধর্মের সমন্বয় করিয়া তিনি বিষ্ণুকেই পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীভাষ্যে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ, বৌদ্ধ, অদ্বৈত ও জৈনধর্মমতের খণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই ধর্মমত গ্রহণ করিলেন এবং অনেক শৈব ও বৌদ্ধ তাঁহার মতানুলম্বী হইলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের দুইটি শাখা—একটি শাখা আচারী আর একটি রামানন্দী। আচারী সম্প্রদায় বর্ণাশ্রমী—স্মার্তমতের সহিত বৈষ্ণবমতের সমন্বয়ে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। আর একটি সম্প্রদায় তাঁহার প্রশিষ্যের প্রশিষ্য রামানন্দ স্বামীর দ্বারা প্রবর্তিত হইল। আচারী সম্প্রদায় লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক—রামানন্দী সম্প্রদায় রামসীতার উপাসক।—ইঁহারা রামকেই ভগবান বলিয়া পূজা করিতেন, এবং জাতিভেদ মানিতেন না। এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতই সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে তুলসী দাসের রামায়ণ আর্যাবর্তে ধর্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বহু উপসম্প্রদায় আর্যাবর্ত ছাইয়া ফেলিয়া ভক্তি ধর্মের প্রচার করিয়াছিল। কবীরপন্থী, রুইদাসীপন্থী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাসী,

দাদুপন্থী, রামসেনেদী ইত্যাদি শাখার নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কোন কোনটিতে মুসলমান প্রভাব সম্পাতিত হওয়ায় বিষ্ণু বা রামের বদলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্থান হইয়াছে। শ্রীসম্প্রদায়ের আচারী শাখার লোকেরা বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচার করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে সেজন্য বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গৃহস্থ অনেক ছিল। রামানন্দী শাখার লোকেরা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশে যে জাতিভেদের শিথিলতা ঘটিয়াছিল তাহা বৌদ্ধ প্রভাবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিসাধনার তুলনায় এবং আলোয়ার বৈষ্ণবদের ঐকান্তিকী রাগানুগ ভক্তিধর্মের তুলনায় শ্রীসম্প্রদায়ের শান্তদাস্যভাবের ভক্তিধর্ম অনেক নিম্নস্তরের। এই ভক্তিধর্মের প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সঙ্গে বরং মাধ্ব সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাধ্বাচার্য মাদ্রাজে পাপ-নাশীনী-নদীর তীরে উড়ুপকৃষ্ণ নামক গ্রামে দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক—তাহাকে মাধ্বসম্প্রদায় অথবা ব্রহ্মসম্প্রদায় বলা হয়। এই সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, এই সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। মাধ্ব জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে বড় করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সম্পর্ক ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক, শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া অবশ্য তিনি স্বীকার করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য দেবের প্রাথমিক ধর্মমত এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের দ্বারা গঠিত। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধকগণের জীবনে অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মমতের ছায়াপাত হইয়াছিল। ফলে, শ্রীচৈতন্য ঐ সম্প্রদায়ের যে সকল সাধকদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন তাঁহারা ভক্তিপথে বহুদূর অগ্রসর। মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোক—তাঁহারই শিষ্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ ও ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার গুরু। কেশবভারতীও মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক—ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসদীক্ষার গুরু। মেঘদর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীকৃষ্ণভ্রমে ভাবাবেশ হইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

'ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর।'

ঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাবাবেশ দেখিয়াই গয়ায় নিমাই পণ্ডিতের মনে প্রেমভক্তির প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল—ঈশ্বরপুরীকেই মহাপ্রভু প্রেমভক্তির গুরু বলিয়া ভক্তিভরে পুরীর জন্মভূমি কুমারহট্টের মাটি তুলিয়া বহির্বাসের অঞ্চলে বাঁধিয়াছিলেন। অদ্বৈত পূর্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যের পথ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন।

'পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরীকৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমূলে বিকাশিল বৃক্ষ মূলে।
এই নবমূল বৃক্ষ করিয়া নিশ্চলে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তিকল্পতরুর যে নয়টি মূলের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক। অতএব দেখা যাইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের একটি শাখা অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রেম ধর্মের পরাকাষ্ঠাকে পুষ্পিতা করিয়া তুলিয়াছেন।

আর একটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম রুদ্রসম্প্রদায়। ইহার প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামী। এ সম্প্রদায়ের দর্শনমত শুদ্ধাদ্বৈত। উপাস্য বালগোপাল। বাৎসল্যভাবের সাধনার ইনি প্রবর্তন করেন। পরে সাধনার

রসের পরিবর্তন হইয়াছিল। মীরাবাই এই সম্প্রদায়ের উপাসিকা। শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদনই এই ধর্মমতের মূলসূত্র। এই সম্প্রদায়ের একজন সাধকের নাম ছিল বল্লভাচার্য। ইনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্তন করেন। কথিত আছে ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ইঁহাকে খুব মানিতেন। বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের মহিমা ঠিক বুঝে নাই—তাঁহারা নানাস্থলে মঠমন্দির গড়িয়া বহু শিষ্যসেবক সৃষ্টি করিয়া গুরুগিরি করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করিতেন। শিষ্যেরাও ধনসম্পদ গুরুচরণে নিবেদন করিয়াই ধন্য এবং খুব ঘটা করিয়া উৎসবাদি সম্পাদন করাকেই ধর্মকার্য মনে করেন। এই সকল গোস্বামীদিগকে পুষ্টিমার্গী বলে· পশ্চিম ভারতেই ইঁহাদের প্রতিপত্তি।

আর একটি সম্প্রদায় আছে তাহার নাম নিম্বার্ক সম্প্রদায়। নিম্বার্ক উত্তর ভারতেরই লোক এবং সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্মমত শ্রীচৈতন্যদেবের পরে প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবকে মাধবসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলা হইল বলিয়া মাধবসম্প্রদায়ের মূলতত্ত্বের সহিত শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিতত্ত্বের অক্ষরে অক্ষরে মিল হইবে একথা বলিতেছি না। মাধবসম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, শ্রীচৈতন্য ছিলেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। শ্রীচৈতন্যের পুরীধামে গমনের পর তাঁহার ভক্তিভাবের সম্ভবতঃ ধর্মমতেরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণাপথের মিলনভূমি ছিল নীলাচল বা জগন্নাথ ক্ষেত্র। দক্ষিণাপথের সর্বপ্রকার বৈষ্ণব ধর্মমতের সমাবেশ হইয়াছিল পুরীধামে। পুরীধামে আসিয়া তাঁহার দ্বৈতভাব অচিন্ত্য-ভেদাভেদে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন—তারপর নবদ্বীপলীলায় তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলার মাধুরী উপভোগ করিতেন। পুরীধামে আসার পর তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া আর্তনাদ করিতেন · আবার নিজের মধ্যেই কৃষ্ণকে পাইয়া দিব্যানন্দে মগ্ন হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের মাথুর প্রবাসের পর শ্রীরাধিকার যে দশা পদাবলী সাহিত্যে দেখানো হইয়াছে—সেই দশায় আবিষ্ট হইয়া তিনি দিব্যোন্মাদ লাভ করিতেন। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধিকা যেমন ভাবসম্মেলনে উল্লসিত হইতেন- সেইরূপ উল্লাস তিনিও উপভোগ করিতেন। তাঁহার জীবনে দ্বৈতভাব অদ্বৈতানন্দে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

এই মহাভাবাবেশ ভাবের ক্রমোন্মেষের নিয়মানুসারে স্বাধীনভাবে তাঁহার জীবনে প্রবুদ্ধ হইতে পারে না- একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে মনে হয়—দক্ষিণাপথ ভ্রমণের ফলেই তাঁহার জীবনে উজ্জ্বলরসের মহাভাবাবেশ প্রকটিত হইয়াছে। রায় রামানন্দ ছিলেন দক্ষিণাপথের লোক, প্রতাপরুদ্রের উপরাজ—পরে মন্ত্রী। তিনি একজন মহাভক্ত ও বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার জীবনে দক্ষিণাপথের আলোয়ার সাধকদের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। অন্ততঃ তিনি তাহাদের সাধন মার্গের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। গোদাবরীতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিজীবনে পরিবর্তন আসিয়াছিল একথা কেহ কেহ বলেন। তাহা যদি নাও হয়—দক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে তিনি বহুশ্রেণীর সাধকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ·সেই সকল সাধকদের জীবনে মধুররসের সাধনার ও মহাভাব-তন্ময়তার ধারা নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে মহাপ্রভু ধর্মপ্রচার করিতে নিশ্চয়ই যান নাই,· তাঁহার নিজের দেশ মহাপাপে দগ্ধপ্রায়—যে দেশের ধর্মের গ্লানির জন্য প্রধানতঃ তাঁহার অবতরণ, সে দেশকে ফেলিয়া যে দেশে সকল প্রকার ধর্মের চরম বিকাশ, সে দেশে ধর্মপ্রচার করিতে যাইবার কথা নয়। তিনি জানিতেন—সকলশ্রেণীর বৈষ্ণব ধর্মমত দক্ষিণাপথেই জন্মিয়াছে—সে দেশে বহু বৈষ্ণবসাধক

আজিও বর্তমান। দাক্ষিণাপথ এক হিসাবে তাঁহার কাছে মহাতীর্থ। সেই তীর্থপরিক্রমা, সাধক ভক্তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা—নব নব ভাবরসসংগ্রহ—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবত ছাড়া তিনি গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঐশ্বর্যশিথিল ভাবে পরিপূর্ণ—তবু তিনি তাহাও উপভোগ করিতেন। নবদ্বীপলীলায় ইহা সহ্য করা চলিত—নীলাচলে এই রসাভাষ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আনন্দ দিত না। বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐশ্বর্যভাব নাই বটে, কিন্তু ভক্তির বা প্রেমের গভীরতাও নাই—তাহাও শেষ পর্যন্ত উপভোগ্য হইত বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণাপথে প্রকৃত মধুর রসের বহু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস নিশ্চই ছিল। এবং বোধ হয় তিনি অবিমিশ্র মাধুর্যরসের বহু রচনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। যে কোন ভক্তিরসের রচনা পাইলেই তিনি পাঠ করিতেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতা ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—এই পুঁথি দুইখানি পাইয়া তিনি নকল করাইয়া আনিয়াছিলেন। তামিল ভাষায় রচিত আলোয়ারদের পুস্তক নকল করিয়া আনা হয় নাই—সম্ভবতঃ তাহার মর্ম তিনি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যে গভীর আকূতির জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেম জীবনে এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত বঙ্গসাহিত্য অপূর্ব—সেই গভীর আকূতি পরিপূর্ণরূপেই আলোয়ারদের রচনায় বর্তমান। চৈতন্যদেব রসের সন্ধানে দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিলেন, আর ঐ চমৎকার সম্পদটি তাঁহার চোখে পড়িল না ইহা হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের মূলতত্ত্ব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলসূত্র যাঁহারা উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন তাঁহাদের ছয় জনের মধ্যে চারিজনের সহিত দাক্ষিণাপথের সম্পর্ক। গোপালভট্ট ত দক্ষিণাপথেরই লোক ছিলেন আর রূপ, জীব ও সনাতন গোস্বামীর পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথের কর্ণাটকদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা বংশধারায় দাক্ষিণাপথের সংস্কৃতি নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের আগে হইতেই ইঁহারাই ধর্মপ্রাণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের চিত্ত পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একটা দাক্ষিণাত্য রসধারা ইঁহাদের বংশধারায় নামিয়া আসিয়া গৌড়ীয় রসধারায় মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় - শুধু রসধারা নয়, সংস্কৃতির ধারাও যেন বিদেশাগত বলিয়া মনে হয়। আর গোপাল ভট্টের সাহচর্য তাঁহারা কতটা যে পাইয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। তবে জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ যাহা বৈষ্ণবধর্মের গীতা,- তাহার বক্তা গোপাল ভট্টই, জীবগোস্বামী ব্যাস মাত্র।

বাঙলার নিমাই

রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল আচার্য

সেদিন সন্ধ্যায় ছিল ফাল্গুনি পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ : ভাগীরথীর তীরে তীরে — নগরের গৃহে-গৃহে রাজপথের পর রাজপথে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আগমন-বার্তা ধ্বনিত হইয়া উঠিল — হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। আকাশের সদ্যরাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্র আসন্ন মুক্তির আনন্দে সেদিন হাসিয়া উঠিল। ভারতের প্রধান বিদ্যাপীঠ, ঐশ্বর্যের কুবেরনিলয়, জ্ঞানবণিকের বাণী-মঞ্জুষা, গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত সেকালের নবদ্বীপ তখন বুঝিতে পারে নাই যে কি একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। সমাজকর্তা অধ্যাপকগণ ন্যায়ের ফাঁকি ও দর্শনের কথা লইয়া যেমন উন্মত্ত ছিলেন, তেমনই রহিলেন—স্নানের ঘাটে ঘাটে নাগরিকদিগের মুখে মুখে শিবমহিম্নস্তোত্রের পরিবর্তে শাস্ত্রচর্চা যেমন চলিত, তেমনই চলিতে লাগিল—অলিতে-গলিতে টোল এবং টোলে টোলে পড়ুয়াগণ নানা গ্রন্থ কুক্ষিগত করিয়া আগেও যেমন বিদ্যাযুদ্ধে নিযুক্ত হইত, তখনও তেমনই হইতে লাগিল। এদিকে মাতা শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে মহাভাবময় একটি অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা—তাঁহাদের দুলাল নিমাই — শশিকলার ন্যায় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার আদরের নাম ছিল নিমাই, এখনও তাহাই আছে এবং পরেও তাহাই থাকিবে।

বাল্যে নিমাই ছিলেন হরিণ শিশুর মতই চঞ্চল এবং সেকালের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যাইয়া স্নানার্থী ও স্নানার্থীদিগকে উৎপাত করিয়া নিজেও আনন্দ পাইতেন, তাঁহাদিগকেও আনন্দিত করিতেন। কেহ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছে দেখিলে তাহাকে বলিতেন — 'ও ফুলে আমারই পূজা কর'।

যখন বিদ্যারম্ভ হইল, নিমাই তখন এত অল্পবয়সে এত অধিক শিখিলেন যে, অধ্যাপক, পড়ুয়া, নাগরিক সকলেই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ঢল-ঢল অঙ্গের লাবণি, চাঁচর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের ভার, আয়ত উজ্জ্বল নয়ন, আজানুলম্বিত ভুজযুগ · তাহার উপর শিরে সরস্বতীর জয়মাল্য এবং কণ্ঠে তাঁহার সপ্তস্বরা বীণা — এ মূর্তির সম্মুখে যিনি আসিতেন তিনিই অবনত হইতেন। মনে হইত এ যেন অগ্নিগর্ভ শৈল, কখন বা বিদারিত হয়! জগন্নাথ মিশ্রের বাসভবন ছিল গঙ্গানগরে রামচন্দ্রপুর নামক এক পল্লীতে। উহা এখন ভাগীরথী গর্ভে গিয়াছে।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক নিমাই পিতৃহীন হইলেন। মা কাঁদিলে পাছে নিমাই কাঁদেন এই ভয়ে শচীদেবী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে পারিলেন না। ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিমাই যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন তখন তাঁহার টোলেই বহু ছাত্র আসিয়া পড়ুয়া হইয়া রহিল। তাহারা দেখিল, এই নবীন অধ্যাপকের বলন-ভঙ্গী অদ্ভুত। বহুলোকের মুখে তখন তাহার যশ ফিরিতে লাগিল — কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নিমাই বড়ই বিদ্যাভিমানী ও দাম্ভিক — দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীকে জয় করিয়া দম্ভ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতমান্য দীধিতির গ্রন্থাকার রঘুনাথ বহু পূর্বেই জানিতেন নিমাই মনে মনে বিনয়ের অবতার। উভয়ে তখন বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পূর্বেই ব্যাকরণের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে। একদিন নৌকাযোগে টোলে যাইবার সময় রঘুনাথ নিমাইয়ের রচিত ন্যায়ের নূতন টীকাখানি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই কহিলেন — "রঘুনাথ কাঁদিতেছ কেন?" রঘুনাথ চোখের জলে ভাসিতে-ভাসিতে বলিলেন — "ভাই আমিও ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিতেছি, কিন্তু তোমার গ্রন্থ প্রচারিত হইলে আমার পুঁথি কেহ স্পর্শও করিবে না, উহা এতই সুন্দর হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম আমিই এই দেশের ন্যায়ের বড় পণ্ডিত হইব, তাহা আর হইল না। তাই কাঁদিতেছি।"

বন্ধুর দুঃখে নিমাই কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুঁথিখানি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন — 'এই আমার পুস্তক গঙ্গায় গেল, আর তোমার ভয় নাই। আমি আর ন্যায় শাস্ত্র চর্চা করিব না — উহা অফল শাস্ত্র।"

একদিন শ্রীকৃষ্ণভক্ত সিদ্ধ তাপস শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার নবরচিত রাধাকৃষ্ণরসঘটিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নিমাইয়ের হাতে দিয়া বলিলেন — "যদি ইহাতে কোন দোষ থাকে তুমি বলিয়া দাও আমি সংশোধন করিয়া লইব।" শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সহিত নিমাইয়ের এই প্রথম পরিচয়। পরে ইনিই গয়াধামে নিমাইয়ের দীক্ষা গুরু হইয়াছিলেন।

বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নিমাইয়ের নব পরিণীতা পত্নী। তাঁহাকে ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক 'নিমাই পণ্ডিত' পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করিতে গেলেন। পূর্ববঙ্গে পৌঁছিয়াই নিমাইয়ের সঙ্গীরা বুঝিতে পারিলেন তাঁহার যশ বহু পূর্বেই সে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ঠিক কোন পথে তিনি গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই বটে, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালে পূর্ববঙ্গের যেসকল স্থানে বিদ্যার কেন্দ্র ছিল, সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বিদ্যার গৌরব সকল স্থানেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে যশোমণ্ডিত হইয়া আচার্য নিমাই পাণ্ডিত্যের মর্যাদাস্বরূপ বহু ধনরত্ন ও বস্ত্রাদি উপহার লইয়া নবদ্বীপে ফিরিলেন। "চৈতন্য মঙ্গল" বলেন যে এই পূর্ববঙ্গে—

চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥

* * * *

নাম-সঙ্কীর্তনে নৌকা প্রভু সাজাইয়া।
পার কৈলা সব লোক আপনি যাচিয়া॥

গৃহে আসিয়া নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন যে, পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিত পণ্ডিতের মতই ধীরভাবে এই দুঃসংবাদ গ্রহণ করিলেন, নীরব অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার বসন ভিজাইতে লাগিল। কিছুকাল পর সনাতন মিশ্র নামক একজন রাজপণ্ডিত ও বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তির পরম রূপবতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন সত্যসত্যই বিষ্ণুর প্রিয়া—দেহে যেমন রূপ, হৃদয়ে তেমনি ভক্তি তেমনি লজ্জা, তেমনি বিনয়, তেমনি সব। বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দরিদ্র নিমাই তখন দেশপূজ্য হইয়াছেন—তাঁহার টোলে ছাত্র আর ধরে না, গৃহ নানা দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইল। শুধু ইহাই নহে, নিমাই যেমন নবদ্বীপের বিদ্যাভিমানীদিগকে জয় করিয়াছেন। তেমনি তখন জয় করিয়াছেন পড়ুয়াদের—তেমনি জয় করিয়াছেন নবদ্বীপের নানা ধনী বণিক ও নাগরিকদের এবং তন্তুবায়, তাম্বুলী, দোকানী, পসারী সকলকে। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দোকানী বিনামূল্যে দ্রব্য দেয়—দাম দিতে গেলে লয় না। তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন—তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসে।

দুই বৎসর পর পিতৃকৃত্য করিবার জন্য গয়াধামে যাইয়া নিমাই বিষ্ণুপাদপদ্মের সম্মুখে বসিলেন। শ্রীগদাধরের চরণপদ্ম দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে ভরিয়া উঠিল—চিত্তভাবে বিভোর হইল। শ্রীমন্দিরে তখন পরম ভাগবত নিমাইয়ের পূর্বপরিচিত ঈশ্বর পুরী উপস্থিত ছিলেন। নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে সপ্রেম আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিমাই কহিলেন— আজ আমার জন্ম সফল এবং জীবন ধন্য হইল। আমি আজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম। দয়া করিয়া আপনি আমাকে দীক্ষা দিন—আমার ভগবদ্ভক্তি হউক—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী—
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে—
ভবতাদ্ভক্তি রহৈতুকী ত্বয়ী ।। —শিক্ষাষ্টক।

ঈশ্বর পুরী পরম পুলকিত হইয়া নিমাইকে দশাক্ষারী মন্ত্র প্রদান করিলেন। ভাবের আতিশয্যে শিষ্যের কণ্ঠ জড়াইয়া গুরু কাঁদিলেন, গুরুকে ধরিয়া শিষ্য কাঁদিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন "অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান।" নিমাইয়ের রোদন-কাতর জীবনের সেইদিন সূত্রপাত হইল।

নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে ফিরিলেন — গয়াধামে পড়িয়া রহিল, জ্ঞানের গরিমা, তর্কযুদ্ধের তীক্ষ্ণাতিতীক্ষ্ণ আয়ুধগুলি এবং মনের ও দেহের মৃগশিশু সুলভ চাঞ্চল্য লীলা ও করি করকের ন্যায় গতি-বিভঙ্গ। তিনি গিয়াছিলেন—পূর্ণশশধর করোজ্জল বাঙ্গালার আনন্দ প্রতিমা, যখন গৃহে আসিলেন তখন দেখা গেল—কৃষ্ণমেঘলিপ্ত বর্ষণোন্মুখ বর্ষার গম্ভীর আকাশ। সেই আকাশ হইতে প্রথম বাদল নামিল গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে। শাক্ত অধ্যুষিত নবদ্বীপে সেকালে হরিভক্তের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাস, শ্রীমানপণ্ডিত, সদাশিব, মুরারী, গদাধর প্রভৃতি যে কয়েকজন নিমাইকে দেখিতে আসিলেন, তাঁহারাও সেই কৃষ্ণমেঘনিঃসৃত বারিধারায় বাহিরে ও মনে ভিজিয়া উঠিলেন। সকলেই আকুল হইয়া গাহিতে লাগিলেন —

সজনি কেকহ আশুব মাধাই—
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাত্তব।
মঝু মনে নাহি পতিয়াই ।। —বিদ্যাপতি

'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন পড়ুয়ারা পড়িবার জন্য নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। তিনি টোলে যাইয়া বসিলেন—ছাত্রেরা পুঁথির ডোর খুলিল। কিন্তু কাহার পড়া, কে পড়ায়। নিমাই শুনিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়"। তিনি বিহ্বলের মত কহিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের ভজন ছাড়িয়া যে হতভাগ্য শুধু শাস্ত্রব্যাখ্যায় পটু হয়, গর্দভের মত সে কেবল বোঝাই বহন করে'।—ছাত্রদিগকে বলিলেন—

তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হইতে আর পাঠ নাহিক আমার ।।

ছাত্রেরা মূক হইয়া গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে নবদ্বীপের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ টোল বন্ধ হইয়া গেল। তখন —"পুস্তকে দিলেন সবশিষ্যগণ ডোর"। গুরু ভাবমুখে দিবানিশি শুনিতে লাগিলেন সেই অব্যক্তের আহ্বান—সেই মন-মজানো, কুল হারানো, সব ছাড়ানো কালার বাঁশী। জগন্নাথ মিশ্রের স্বগ্রামবাসী—শ্রীহট্টের রত্নগর্ভের আচার্য যখন তাঁহার দুয়ারে বসিয়া সশিষ্য নিমাইয়ের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা পাঠ করিতে লাগিলেন, নিমাই তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

লোকে বলিল নিমাই পণ্ডিতের বায়ুরোগ হইয়াছে। শচীদেবী শুনিলেন—শুনিয়া রোদন করিলেন; আর বিষ্ণুপ্রিয়া? বাণবিদ্ধা কপোতীর মত ছট্-ফট্ করিতে করিতে দ্বারের অন্তরাল হইতে তিনি দেখিতে লাগিলেন—কে বলে তাঁহার স্বামী পাগল? কে বলে তিনি বায়ুরোগগ্রস্ত? ওই-ত তাঁহার জগজ্জয়ী স্বামী—তাঁহার ইহকাল-পরকালপ্রভু, গৃহ-প্রাঙ্গণে করতালি দিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে, নিমাইয়ের ভক্ত শিষ্যগণ। প্রেমসিন্ধু মথিত করিয়া ক্রমেই তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, সেই তরঙ্গের চূড়ায়-চূড়ায় সংস্থাপিতচরণ বাঁশরী-মোহন মাধবের মধুর মুরলী যেন তারায়, উদারায়, মুদারায় — মীড়ে মূর্চ্ছনায় অমৃতলোকের মৃত সঞ্জীবনী সঙ্গীত ধারায় বিশ্ব বিমোহিত করিয়া দিল। মধু স্পর্শে তখন সবই হইয়া উঠিল মধুরে মধুর — বাণীর শব্দ মঞ্জুষা তখন নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল, রহিল কেবল একটি মাত্র শব্দ — মধুর!

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং—
মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

বাঙ্গলা দেশে এই প্রথম জগন্মঙ্গল শ্রীনাম-কীর্তনের সৃষ্টি হইল। (১৫০৮ খৃস্টাব্দ)। নাচিয়া গাহিয়া এবং কাঁদিয়া কাঁদাইয়া যে শ্রীভগবানের চরণলাভ করা যায়, নিমাই আপনি নাচিয়া, আপনি গাহিয়া ও আপনি কাঁদিয়া সেই তত্ত্ব জীবকে শিখাইলেন — শিখাইলেন, "বিষ্ণু-সংকীর্তনে কালো নাস্ত্য" পৃথিবীতলে। ইহারই নাম নাম-সংকীর্তন। এই সংকীর্তনের কালে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই নাম সংকীর্তন — মহাপ্রেম, মহানৃত্য, মহাসংকীর্তনের নামে প্রসিদ্ধ। পাদকর্তা লোচন দাস বলিয়াছেন, এই সংকীর্তনই সকল ধর্মের সার ও পঞ্চমবেদ। নামের খুবই মাহাত্ম্য বটে, তবে বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে যে কিছুই হয় না — প্রভু কীর্তনে মত্ত হইয়া মানবকে তাহাই শিখাইয়াছেন। ভক্তিহীনও নাম করিতে করিতে সেই অভ্যাস যোগের ফলে পরম ভক্ত হইয়া উঠে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন — "তাই নাম কর; সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়; যে সব জিনিস দুদিনের জন্য — যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ — তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।"

ইহার পর যাহা যাহা ঘটিল সে সমুদয়েই অপরূপ। অপরূপ, শ্রীবাসের গৃহে জ্যোতির্ময় দেহ মহাপ্রভুর অভিষেক — অপরূপ মহাপ্রভুর বরদান — অপরূপ, কখনও বা প্রভুর ভক্তভাব, কখনও আবার ভগবান ভাব। অপরূপ, সেই নন্দন আচার্যের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও পূজার অন্তে ব্যাসের কণ্ঠে মাল্যদান না করিয়া, ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রীনিমাই-এর মস্তক বেড়িয়া উহা স্থাপন — অপরূপ, শ্রীবাসের গৃহে প্রভুর মহাপ্রকাশ ও বিহ্বল অদ্বৈতাচার্যের বর প্রার্থনা। ইহা ছাড়া আরও অনেক অপরূপ ও অসাধারণ বিষয় আছে যেগুলি আমাদের ন্যায় ভক্তিহীন মানবের চক্ষে অলৌকিক — এবং অলৌকিক বলিয়াই বিশ্বাসের অযোগ্য! কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার সবই আছে। বিশ্বাস হারাইয়াছে যে, সে তাহার সবই হারাইয়াছে! একজনের পক্ষে যাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইবার বিষয়, অনেকের পক্ষেই তাহা বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবার বস্তু — বিশ্বাসে বিচার নাই, বিচারের পথ সংশয়াকুল এবং "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"।

আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই মানুষের ভিতরই মানুষ-রতন আছেন এবং তাঁহাকে প্রকাশিত করাই

সাধনা বা তপস্যা। অবতারেরও দেহবুদ্ধি আছে। শরীর ধারণ করিলেই মায়া। "তবে অবতার ইচ্ছা ক'রে চোখে কাপড় বাঁধেন। যেমন ছেলেরা কানা-মাছি খেলে। মা ডাকলেই খেলা থামায়।...নর লীলার অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয় — তাই চিনতে পারা কঠিন।

মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক কখনও বা ভয় — ঠিক মানুষের মত। অবতারাদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করে তবে লীলা করেন।" (১) কথাতেই বলে — বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। দেব নরকে যে সর্বপ্রকারে নরই হইতে হয় ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, নিত্যসিদ্ধ অবতার পুরুষের আগমনই শুধু লোক শিক্ষার জন্য। শুধু মুখে নহে প্রাণে-প্রাণে "তত্ত্বত" এই কথাটি বুঝিতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন —

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ —গীতা ৯/১১

সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরমতত্ত্ব না বুঝিয়া মূঢ়েরা মনুষ্য-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার গীতায় বলিয়াছেন — "জগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু এবং তাঁহার মূর্তি বা অংশ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তবে ভগবানের প্রকাশেরও ক্রম আছে। ভগবান নিত্য, শুদ্ধ, পরমব্রহ্ম। সাধারণ জীবে ভগবানের অংশ মায়ার আবরণে আবদ্ধ রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধ জীব তাঁহার দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থানে-স্থানে ভগবানের বিশেষ শক্তির আবির্ভাব — সেগুলি বিভূতি বলিয়া পরিচিত।

অবতারগণ কখনও ভক্ত, কখনও বা ভগবান স্বয়ং। নিমাইও ছিলেন তাহাই। যখন ভক্ত তখন তিনি সাধারণ মানব বিনয়ের অবতার — দীনের দান।

শ্রীব্যাসের গৃহে মহাপ্রকাশের দিনে নবদ্বীপের বাজারে কলারখোলা বেচা শ্রীধর যখন প্রভুর অনুগ্রহ পাইলেন তখন পরমানন্দে কহিলেন — প্রভু আমি আর তোমার কাছে কি চাহিব ? যদি নিতান্তই বর দিবে তবে এই চাই —

যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেক মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউ তান্ চরণ যুগল ॥

ভক্ত চিনি হইতে চাহেন না, চিনি খাইতে চাহেন — নতুবা একটিবার প্রাণ ভরিয়া নাম লইলেই ত মুক্তি হস্তামলকবৎ হয়, কিন্তু শ্রীধর সে মুক্তির কাঙ্গাল নহেন — তিনি চাহেন কোটি কোটি বার জন্ম হউক তাহাতে দুঃখ নাই — কিন্তু সেই কোটি কোটি জন্মেই যেন প্রভুর চরণসেবা করিয়া ও তাঁহার নাম গান করিয়া তিনি আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিতে পারেন। শ্রীধরের মন যেন তখন কাতর হইয়া বলিতেছিল, হে প্রভু — করণ বিপাকে গতাগত পুনঃ পুন।

কিন্তু তুমি আজ এই বর দাও যেন — 'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ'। জন্ম জন্মান্তরে হইনা কেন

মানুষ, হইনা কেন পশু, হইনা কেন পাখী — অথবা হইনা কেন কীট-পতঙ্গ — এই মিনতি করি, 'যেন 'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ'।

ব্রহ্ম হরিদাস বর চাহিয়া বলিলেন — 'আমাকে দান কর প্রভু, আরও দান কর — তবে ত তোমার কৃপা পাইবার যোগ্য হইব ; এই বর দাও দয়াময়, যেন প্রতিদিন ভক্তের প্রসাদ পাই।' ভক্ত যে ভগবান অপেক্ষাও বড়, হরিদাসের প্রার্থনায় সেদিন তাহাই সূচিত হইয়াছিল।

ধর্মগুরু নিমাই ছিলেন অতিশয় সজীব বীজ। তাঁহার দর্শন, স্পর্শন বা ইচ্ছামাত্রই লোকের হৃদয়ে ভক্তিবীজ অনুপ্রবিষ্ঠ হইতে লাগিল। তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র অপরেও তাঁহকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিলেন, তিনি করতালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন—হরি হরয়ে নমঃ, হরি হরয়ে নমঃ—যে সেই গান শুনিল, সেও গাহিতে লাগিল—হরি হরয়ে নমঃ। নবদ্বীপ টলমল করিয়া উঠিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহারই নাম—নাম বিলানো বা প্রেম বিলানো। সেই দান শুধু মহাশক্তিধরের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে। আমরা অনেকেইত কীর্তন শুনি—কিন্তু কয়জনের তাহাতে প্রাণ গলে? গলে না, তাহার কারণ এই যে, গায়কই নিজে গেলন না!

নাম-গানের স্রোতে যখন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়'—লোকে তখন আনন্দ পাইবার জন্য নৃত্য গীত করিল না। প্রেমানন্দে মত্ত হইবার ফলে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল। সে গীতে শব্দের ঝঙ্কার ছিল না, তাহার কোনও শব্দেই কোনও চমকপ্রদ চিত্তমুগ্ধকর ভাবের সমাবেশ ছিল না ; সে ছিল একটি নমস্কার মাত্র—হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ—শুধু এই পর্যন্ত। সে গানে সুর সংযোজনার বৈচিত্র্যময় কোন কৌশল ছিল না। তবে সকল আনন্দের আনন্দ যিনি, তিনি সেই গানে ও নৃত্যে আত্মপ্রকাশ করিতেন—শক্তিধর গুরু নিমাইয়ের শক্তি-সংক্রমণের গুণে। আনন্দময় তাই তখন গায়কের, নর্তকের, শ্রোতার ও দর্শকের মনের মধ্যে আসিতেন। প্রাণে আসিতেন—দেহে দেহে আবির্ভূত হইতেন। আনন্দময়ের আনন্দে ভিতর বাহির ভরপুর হইয়া উঠিত লোকে তাই নাচিতে আরম্ভ করিত, গাহিয়া উঠিত—আনন্দের আতিশয্যে ভাঙ্গিয়া পড়িত ; মূর্চ্ছা যাইত—সমুদ্র তরঙ্গ যেমন প্রবল উচ্ছ্বাসে তটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং শেষে নিজেকে সকল আবেগ হইতে নিঃশেষে রিক্ত করে সেইরূপ। যাহারা ভক্ত, তাহারা এই অদৃষ্টপূর্ব ভাব দেখিয়া তখন বিস্ময়ে বলিতে লাগিল—"কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গালবেশে, হরি হ'য়ে বলছ হরি।"

"আমরা চিরকালই দ্বৈতবাদিভাবে সাধনভজন আরম্ভ করিয়া থাকি। তখন এই জ্ঞান থাকে যে, ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রেম উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবানও যেন মানুষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মানুষ—পিতা, মাতা, সখা নায়ক প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ লইয়া ভগবানের উপর আরোপ করে, আর যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা। তখন 'আমিই' 'তুমি' ও 'তুমিই' 'আমি' হইয়া যায়। তখন দেখা যায়, তোমার উপাসনা করিলেই আমার উপাসনা, আর আমার উপাসনা করিলেই তোমার উপাসনা হইল। সেই অবস্থায় যাইলেই, মানব যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা পাইয়া থাকে। মানুষ যেখান হইতে আরম্ভ করে, তাহার শেষও সেইখানে হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই তাহার আত্মপ্রেম ছিল —কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া ভ্রম হওয়াতে প্রেমকেও স্বার্থপরতা-দুষ্ট করিয়াছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্ত স্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ-আলোকের প্রকাশ হইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোনও একটি স্থান বিশেষে অবস্থিত পুরুষ বিশেষ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তিনি তখন যেন অনন্ত প্রেমে পরিণত হইলেন। মানুষ স্বয়ং তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি তখন ঈশ্বর সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন। পূর্বে তাহার যে সমুদয় বৃথা বাসনা

ছিল, তিনি তখন সে সকলই পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, আর প্রেমের চরম শিখরে গিয়া তিনি দেখিতে পান,—প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক তিন একই বস্তু।" (১)

এই শিক্ষা দিবার জন্যই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্রায় দুইটি বৎসর একমাত্র সঙ্গী শ্রীচৈতন্য—কড়চা রচয়িতা গোবিন্দ দাসকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু পদব্রজে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিলেন এবং প্রবজ্যা সমাপ্ত হইলে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৫১১ খ্রীস্টাব্দ)। দাক্ষিণাপথের দুর্গম পার্বত্য বনভূমি তাহাকে বাঁধা দিতে পারিল না। হিংস্র ব্যাঘ্রাদি তাহার সম্মুখে আসিল, কিন্তু হিংসা ত্যাগ করিয়া নতমস্তকে চলিয়া গেল। বারবণিতা লক্ষ্মীবাঈ ও সত্যবাঈ তাহাকে জয় করিতে আসিয়া নিজেরাই শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া গেল! নিমাই যেখানেই গেলেন, ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রচারিত হইলেন। তাহার মন্ত্রে দস্যু সাধু হইল, অদ্বৈতবাদী দ্বৈতমত গ্রহণ করিলেন। অবতার-পুরুষের স্বাভাবিক ঐশ্বর্যসুলভ অসাধারণ শক্তি-সংক্রমণ-ক্ষমতার প্রভাবে গৌড়বঙ্গ হইতে নীলাচলের পথে যেমন শত শত লোক তাহার মুখে হরিনাম শুনিবামাত্র নাম-কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যেও তাহাই ঘটিল। তিনি প্রচার করিলেন—

হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং।
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

নাম-যজ্ঞের এই মহামন্ত্র অজপা-সাধন ('কেবলং'—নিরন্তরং নাম জপ) পাইয়া এই যুগ ধন্য হইয়াছে, কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। তাহারা শিখিয়েছে—নামে ও নামীতে ভেদ নাই।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোক বৈষ্ণব-ধর্মমত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য কাঞ্চিপূর্ণ, যামুনাচার্য, মহাপূর্ণ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-প্রভুগণ ভক্তি মন্ত্রের প্রচার করিয়া মান্দ্রাজ অঞ্চলকে হরিপরায়ন করিয়াছিলেন। সেই উর্বর ক্ষেত্রে রামানুজ স্বামী যখন ভক্তির বীজ উপ্ত করিলেন, তখন অতি সহজেই লোকের মনে অদ্বৈতভাব খণ্ডিত হইয়া দ্বৈতভাব স্থান পাইল—তাহারা হরি-চরণ লাভের জন্য ভক্তিপথের পথিক হইল। যখন লোকে দেখিতে পাইল যে, নবদ্বীপ-চন্দ্রই সেই ভক্তিঘন প্রেমমূর্তি, তখন তাহাকেই ভগবানের প্রেমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করিল না।

দাক্ষিণাত্য হইতে পুরুষোত্তমে ফিরিলে পর গৌড়বঙ্গের বহু ভক্ত নানা উপচার বহন করিয়া বারবার নিমাইয়ের চরণ-দর্শন করিতে আগমন করিতেন। তাহার অপ্রকট হইবার কাল পর্যন্ত এইরূপই হইত। এই সময়ে যে সকল লোক নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেন, কুলীনগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত শিবানন্দ সেন সেই সকল যাত্রীদিগের ব্যয় বহন করিতেন। (২)

যাহা হউক, কিছুকাল পুরুষোত্তমে থাকিয়া নিমাই একবার গৌড়ে আসিলেন (৩) এবং সনাতন ও রূপকে "আত্মসাৎ" করিয়া গৌড় হইতে তাহার চির-কামনার স্থান শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। কি আকুলতাই যে ছিল সেই যাত্রায়, ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু কানন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। ব্যাঘ্রাদির হুঙ্কার শুনিয়া সেবক বলভদ্র পদে পদে কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রভু রহিলেন একেবারে ভয়শূন্য—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি যে তখন সর্বেন্দ্রিয় দিয়া শ্রীবৃন্দাবনকেই আস্বাদন করিতেছিলেন—শ্বাপদের গর্জন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে প্রভুর এইরূপ ভাবান্তর ঘটিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল—বৃন্দাবনের প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতা, প্রতি পুষ্প তাঁহার কত সুপরিচিত—তাঁহার কত আত্মীয় তাহারা। সম্মুখে যখন দেখিলেন 'পরিগতপরিসরা' সুনীল যমুনা—তপন কিরণে হীরকবৎ জ্বলিতেছে, তখন তিনি আবেগে জল-মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। আর নদীস্রোত হইতে উঠিতে চাহেন না। যখন উঠিলেন তখন তাঁহাকে কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও হুঙ্কার করিতে এবং কখনও বা মূর্ছিত হইতে দেখিয়া বলভদ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল! সে কি জানিত যে, এইরূপ "ভাব-সমাধিতে ভক্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারেন না, মাতালের ন্যায় ঢলিয়া পড়েন এবং সাধারণের দুর্বোধ্য অলৌকিক ভাষায় কথা বলেন। লোকে তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া পাগল বলে। (তিনি) কখনও রোদন করেন, কখনও হাসেন, কখনও আনন্দিত হন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও নামকীর্তন করেন, কখনও ভগবানের গুণগান করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করেন এবং কখনও বা স্থিরভাবে বসিয়া থাকেন!" (৪) --"ইহারই নাম প্রেমোন্মাদ"।

দীপের আগে আগে যেমন তাহার দ্যুতি চলে, মহাপ্রভুর আগে আগে তেমনি তাঁহার মগ্ন শক্তির দ্যুতি চলিতে লাগিল। সেই দ্যুতির স্পর্শে বারাণসী একদিন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রগাঢ় পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে অগ্রে করিয়া সেদিন বারাণসীতে একটি মহতী সভা বসিল।

প্রকাশানন্দ তখন জানিতেন না যে ঈশ্বর শুধু নিরাকার নহেন — তিনি সাকার এবং নিরাকার দুই-ই — তিনি সচ্চিদানন্দ। "সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে — নানা রূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তি হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার! এমন জায়গা আছে বরফ গলে না — স্ফটিকের আকার ধারণ করে।" (৫)

এ সকল ভাব প্রকাশানন্দের হৃদয়ে ছিল না। জ্ঞানবাদীদের সেই ধর্মসভায় দশ সহস্র সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। ভক্ত চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতনকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু যখন সেই সভায় আসিলেন, তখন তাঁহার জ্যোতির্ময় দেবকান্তি দেখিয়া সভাগৃহে গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সকলকে প্রণাম করিয়া প্রভু সকলের পদপ্রক্ষালন স্থানে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন! এই অদৃষ্টপূর্ব দীনতা সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। পূর্ব বিদ্বেষভাব বিস্মৃত হইয়া প্রকাশানন্দ সসম্মানে প্রভুকে আনিয়া যথাযোগ্য আসন দান করিলেন।

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া।। —চৈতন্যচরিতামৃত

প্রভুকে আসন দান করিলে পর সেই নীরস কঠিন হিমালয়ের অন্তরে মৃদু কম্পন আরম্ভ হইল! পর্বত তখন তাহা অনুভব করিতে পারিল না।

শুষ্ক জ্ঞানের সহিত তখন সরস ভক্তি ও প্রেমের বিচার আরম্ভ হইল। সে বিচারে জ্ঞান পরাজয় মানিল এবং প্রেম ও ভক্তির বিজয় ঘোষিত হইয়া গেল। জ্ঞান যায় দ্বার পর্যন্ত — ভক্তি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সংসারটাকেই ওলোট-পালোট করিয়া দেয়! প্রভুর বিজয়বার্তা অগ্নির ন্যায় বিস্তৃত হইতেই

বারাণসী তাঁহাকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল — মুক্তির প্রাণমদ মন্ত্র পাইলে ব্যামোহিত জীব যেমন পরিপূর্ণ আনন্দে নাচে, সেই রকম।

প্রকাশানন্দ প্রভুর সে নৃত্য দেখিলেন। দেখিলেন, — প্রভুর হেমদণ্ডের ন্যায় সুবৃহৎ বাহুযুগ। ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত হইতেছে ; মধুর হাস্যে কপোলদেশ যেন স্খলিত চন্দ্রকরে স্নিগ্ধজ্জ্বল হইয়াছে, প্রশান্ত নয়নদ্বয় প্রভাতের তারার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে — তাহা হইতে নিয়ত ঝরিতেছে অসংখ্য অসংখ্য মুক্তা ফল! কনককমলের কেশর অপেক্ষাও মনোহর সেই দেবকান্তি হইতে অমৃতের তরঙ্গ যেন নিঃসারিত হইয়া দশদিকে আনন্দ পরিবেশন করিতেছে — পুণ্য পরিবেশন করিতেছে — প্রেম পরিবেশন করিতেছে -- মাধুর্য পরিবেশন করিতেছে! সেই মাধুর্যে তখন সকলই হইয়া গিয়াছে মধুরং মধুরং। সেই মধুর রসে সিক্ত হইয়া একখানি সুবর্ণ প্রতিমা যেন মধুর হইতেও কোন অশরীরী মধুরকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। চরণনূপুরে তালে তালে বাজিয়া উঠিতেছে -- মধুরং মধুরং — মধুরং মধুরং — মধুরং মধুরং!

বিকম্পিত হিমালয় এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পাষাণকারায় যে অলকানন্দা এতদিন বন্দিনী ছিল তাহা সহসা উন্মুক্ত গোমুখীর দ্বার দিয়া শতধারে উৎসারিত হইতে লাগিল। দণ্ডীদিগের স্বামী প্রকাশানন্দ তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু দূরে নিক্ষেপ করিয়া যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন —

"বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্।" —প্রকাশানন্দ।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈ-ও তুমি॥ —চণ্ডীদাস।

ভারতবিজয়ের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা হইয়া গেল। বিজিত ভারত সেইক্ষণে বাঙ্গলার চরণে প্রণতি জানাইল।

ইহার পর অষ্টাদশবর্ষ নীলাচলে বাস করিয়া মহাপ্রভু একদিন বাথায় বর্ষণ-সিক্ত, হতাশায় মেঘলিপ্ত আষাঢ় মাসে অপ্রকট হইলেন।

---

(১) ভক্তিরহস্য—স্বামী বিবেকানন্দ
(২) গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী
(৩) চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস
(৪) ভালবাসা ও ভগবৎ প্রেম—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ
(৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম

চৈতন্যদেবের নাম ও ধাম

ডক্টর সুখময় মুখোপাধ্যায়

মহাপ্রভুর 'চৈতন্যদেব' নাম এসেছে তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' থেকে। কেউ কেউ ইদানীং তাঁকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী' বলে অভিহিত করছেন, যেহেতু তাঁর গুরুর নাম 'কেশব ভারতী'।

এ নাম নিয়ে কোন গণ্ডগোল নেই। তাঁর পূর্বাশ্রমের পোশাকী নাম 'বিশ্বম্ভর' নিয়েও তেমন কোন গোলযোগ নেই। এই নামের ইতিহাস সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মের আগে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাঁর জন্মের পর দেশে বৃষ্টি পড়ে, শস্য ফলে—তাই বিজ্ঞজনেরা তাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' রাখতে বলেন,

> বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।
> এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার।
> এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
> দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥
> জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
> পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিসা নারায়ণে ॥
> অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম। (চৈ, ভা, আদি ৩)

আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা সরল ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার দিনে (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ খ্রীঃ)। আর জন্মের ঠিক কুড়ি দিন পর তাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' রাখা হয় (এ কথা জয়ানন্দ লিখেছেন)। তা'হলে ১৪৮৬ খ্রীঃ-র ৯ই মার্চ তারিখে তাঁর এই নাম হয়। ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে এ দেশে প্রচুর বৃষ্টি পড়া এবং তাইতে দেশের শস্যশ্যামলা হওয়া প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেইজন্যে, চৈতন্যদেবের এই নামকরণের যে ব্যাখ্যা বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন, তার মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তা বলা কঠিন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়--চৈতন্যদেবের অগ্রজ বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম রাখা হয়েছিল।

এখন তাঁর ডাক নাম 'নিমাঞি' (আধুনিক রূপ নিমাই) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই নামটির অর্থ আমাদের অজ্ঞাত। প্রায় সকলেই মনে করেন 'নিম' থেকে 'নিমাঞি' হয়েছে। কিন্তু 'নিম' নামক উদ্ভিদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সম্পর্ক কি ? এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ লোক এক ভাবে দেয়, পণ্ডিতেরা আর এক ভাবে। সাধারণ লোকরা বলে যে চৈতন্যদেবের নিম গাছের তলায় জন্ম হয়েছিল বলে এরকম নাম হয়। ছোট বেলায় একটি গান (শচীদেবীর উক্তি) শুনেছিলাম,

> যখন জন্মিলি নিমাই নিমতরুতলে।
> হয়ে কেন না মরিলি না করিতাম কোলে ॥

কিন্তু নিমগাছের নীচে চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ার কথাটা একেবারে আষাঢ়ে কল্পনা। কোন চরিত-গ্রন্থে এর বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নেই — জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে তাঁর "সূতিকামন্দিরে" অর্থাৎ আঁতুড় ঘরে জন্ম হয়েছিল।

পণ্ডিতেরা বলেন চৈতন্যদেবের 'নিমাঞি' নাম রাখা এক ধরনের তুক ; এর তাৎপর্য এই যে, যমকে জানাবো এ ছেলে নিমের মত তেতো — এর দিকে সে যেন নজর না দেয় ; জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীর অনেকগুলি সন্তান শৈশবে মারা যাওয়ার ফলেই এই জাতীয় নাম রাখা হয়েছিল।

এই মতটির বিরুদ্ধে একটি প্রবল যুক্তি দেখানো যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভিদ 'নিম'কে 'নিম' বলা হত না, বলা হত 'নিম্ব'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন (চৈ, চ, মধ্য, ৮)

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥

এর আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। কেন চৈতন্যদেবের 'নিমাঞি' নাম হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, যে — "পতিব্রতা"রা এই নাম রাখতে বলেন :

ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তাঁর নাম সে নিমাই ॥ (চৈ, ভা, আদি, ৩)

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে,

ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই। (চৈ, চ, আদি, ১৩)

কিন্তু 'নিমাঞি' শব্দের অর্থ কি, বৃন্দাবনদাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন নি।

এমন অবশ্য হতে পারে যে 'নিমাঞি' একটি তুক-নামই এবং তা 'নিম' থেকেই এসেছে। কিন্তু 'নিম' মানে এখানে 'নিম্ব' নয়। 'নিম' শব্দ তখন বাংলায় ব্যবহৃত হত 'অর্ধেক' অর্থে ; এখনও 'নিমরাজী', 'নিমাসরাই' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তার স্মৃতি রয়েছে। এই 'নিম' বা 'নিমা' ফার্সী শব্দ ভাণ্ডার থেকে গৃহীত (ফার্সী ভাষায় 'নিম' মানে অর্ধেক)। পতিব্রতারা সম্ভবত চৈতন্যদেবের 'নিম' বা 'নিমা' নাম রেখেছিলেন, তার সঙ্গে আদরের অনুরোধে 'ঞি' যুক্ত হয়েছে, এটি তখনকার দিনে নামের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত হত, যেমন 'রামাঞি'। চৈতন্যদেবের এই নাম রাখার তাৎপর্য হয়ত এই,—যম, ডাকিনী, শাঁখিনী প্রভৃতিকে বলা হচ্ছে এ ছেলে অর্ধেক, পুরো নয় ; একে নিয়ে তোমার কোন লাভ হবে না।

'নিমাঞি' সাধারণ ডাক নাম হওয়াও অসম্ভব নয়। সংখ্যা দিয়ে নাম রাখার রেওয়াজ আমাদের দেশে আগে ছিল—এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি প্রভৃতি নাম থেকে তার দৃষ্টান্ত মেলে। সেইভাবেই হয়ত চৈতন্যদেবের ডাক নাম রাখা হয়েছিল 'নিম' বা 'নিমা' অর্থাৎ অর্ধেক।

এখন, চৈতন্যদেবের ধাম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অনেকেই মনে করেন, চৈতন্যদেবের আদি দেশ ছিল উড়িষ্যার জাজপুরে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। চৈতন্যদেবের জীবনের শেষার্ধ উড়িষ্যাতেই অতিবাহিত হয়েছিল। উড়িয়া ভাষায় তাঁর কয়েকটি জীবনীগ্রন্থও রচিত হয়েছিল—কোথাও এ কথা লেখা নেই যে চৈতন্যদেবের আদি দেশ উড়িষ্যায় ছিল। আসলে, যারা চৈতন্যদেবকে 'উড়িয়া' বানাচ্ছেন, তাঁদের একমাত্র সম্বল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। কিন্তু জয়ানন্দও লেখেননি যে চৈতন্যদেবের আদি বাড়ি উড়িষ্যায় ছিল। জয়ানন্দ লিখেছেন,

চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব পুরুষ
আছিল জাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাইয়া গেলা
রাজা ভ্রমরের ডরে ॥

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উৎকলখণ্ড, ১ম অঃ) এর অর্থ—চৈতন্যদেবের জনৈক পূর্ব পুরুষ (কিছু সময়ের জন্য) জাজপুরে ছিলেন, কিন্তু রাজা ভ্রমরের (প্রকৃত নাম কপিলেন্দ্র দেব, রাজত্বকাল ১৪৩৪-৬৭ খ্রীঃ) ভয়ে পিতৃভূমি শ্রীহট্টে পালিয়ে যান (সম্ভবত তিনি কপিলেন্দ্র দেবের অসন্তোষ উদ্রেক করেছিলেন)।

চৈতন্যদেবের আদি দেশ যে শ্রীহট্টেই ছিল (উড়িষ্যায় নয়), তার স্বপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ দিচ্ছি,

(ক) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (এসিয়াটিক সোসাইটি সং, নদীয়াখণ্ড, ১ম অঃ) লেখা আছে,

(শ্রীহট্টের) জয়পুরে যত যত ব্রাহ্মণের ঘর।
দিব্যমূর্তি মহাবিদ্যা মহা ধনেশ্বর ॥
রবির মহাকুল মহাবংশ প্রসূত।
দিগ্বিজয়ী নিজ দর্শন ব্যাখ্যা চতুর্ম্মুখ ॥
হেন বংশে জগন্নাথ মিশ্রের উৎপত্তি।

অর্থাৎ, জয়পুরে রবি বলে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরই বংশে জগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু এই 'রবি' জগন্নাথ মিশ্রের পিতা বা পিতামহ হতে পারেন না, কারণ জয়ানন্দ তাঁর বইয়ের সন্ন্যাসখণ্ডে (৫ম অঃ) লিখেছেন যে জয়ানন্দের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে জনার্দন, ধনঞ্জয় ও রামকৃষ্ণ দিগ্বিজয়ী, রামকৃষ্ণ দিগ্বিজয়ীর পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে বিরূপাক্ষ ও ক্ষীরচন্দ্র। ক্ষীরচন্দ্র জগন্নাথের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ। রবি তারও আগেকার লোক ; তাঁর সময় ১৩০০ খ্রীঃ-র পরবর্তী নয়। সুতরাং কপিলেন্দ্র দেব বা রাজা ভ্রমরের ভয়ে জগন্নাথের কোন পূর্বপুরুষ যদি দেশত্যাগ করে থাকেন, তিনি রবি হতে পারেন না, যেহেতু কপিলেন্দ্র দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করতেন। কিন্তু জয়ানন্দ পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে অন্তত রবির সময় থেকে জগন্নাথের বংশ শ্রীহট্টের জয়পুরের অধিবাসী ছিলেন।

(খ) সে সময়ে এক দেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য দেশের ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না। চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর আদি বাড়ি ছিল শ্রীহট্টে। জগন্নাথের পূর্বপুরুষ যদি ১৪৩৪-৬৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উড়িষ্যা থেকে শ্রীহট্টে আসতেন, তাহলে এরকম একটি "বিদেশী" বংশের ছেলের সঙ্গে নীলাম্বর কখনই তাঁর মেয়ে শচীর বিবাহ দিতেন না।

(গ) মুরারী গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্'-এ লেখা আছে যে, চৈতন্যদেব পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ; উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই নামের কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। জয়ানন্দ লিখেছেন (উৎকলখণ্ড, ১ম অঃ) যে চৈতন্যদেব জাজপুরে কমললোচন নামে একজন স্ববংশের লোকের দেখা পেয়েছিলেন। এ ব্যাপার খুবই সম্ভব, কারণ চৈতন্যদেবের যে পূর্বপুরুষ

জাজপুর থেকে শ্রীহট্টে ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁর কোন ছেলে বা ভায়ের জাজপুরে থেকে যাওয়া —এবং কমললোচনের তারই বংশধর হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জাজপুরের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বংশের সম্পর্কের কথা জয়ানন্দ ভিন্ন আর কোন চরিতকার লেখেননি। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, চৈতন্যদেবের কোন পূর্বপুরুষই কখনও জাজপুরে বাস করেননি।

যা হোক, চৈতন্যদেবের আদি দেশ শ্রীহট্টে ছিল বলে প্রমানিত হল। জয়ানন্দ বারবার লিখেছেন যে শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম ছিল চৈতন্যদেবের বংশের নিবাসভূমি। কিন্তু শ্রীহট্টের লোকরা বলেন চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি ছিল ঢাকা-দক্ষিণ নামে একটি গ্রামে (Assam District Gazetteer, Sylhet, Chap-III, p. 87)। জয়পুর বলে কোন গ্রাম এখন শ্রীহট্টে নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে, ঢাকা-দক্ষিণের প্রাচীন নামই ছিল জয়পুর। "ঢাকা-দক্ষিণ" নামটি আধুনিক ধরণের।

এখন, চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হয়। নবদ্বীপ খুব পুরোনো শহর। এখনকার নবদ্বীপ গঙ্গার (ভাগীরথী) পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কিন্তু চৈতন্যদেবের আমলে নবদ্বীপ যে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে; নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় আসবার সময় চৈতন্যদেব গঙ্গা পার হয়েছিলেন। বর্তমানে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত "মায়াপুর"-কে অনেকে চৈতন্যদেবের জন্মভূমি বলে নির্দেশ করছেন; এখানে মন্দিরও হাল আমলে স্থাপিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' (নরহরি চক্রবর্তী) বইয়ে লেখা আছে যে নবদ্বীপের 'মায়াপুর' নামক পল্লীতে চৈতন্যদেবের বাড়ি ছিল। কিন্তু ঐ মায়াপুর যে এখনকার "মায়াপুর", তার কোন প্রমাণ নেই; এখনকার "মায়াপুর" বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সরকারী কাগজপত্রে "মিঞাপুর" বলে উল্লিখিত হয়েছে; সম্ভবত এটিই এর আসল নাম, কারণ এখানে অনেক মুসলমানের বাস ছিল। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব তীর্থ হিসাবে বর্তমান নবদ্বীপের প্রসিদ্ধি বরাবর আছে। যদি বলা যায়, চৈতন্যদেবের বাড়ি এখানে ছিল না, মিঞাপুরে ছিল — তাহলে প্রশ্ন উঠবে, মাঝখানের কয়েক শো বছর এই স্থান বিস্মৃত ও অবহেলিত হয়ে পড়েছিল কেন? চৈতন্যদেবের অসংখ্য ভক্ত ছিলেন ও আছেন; তাঁরা চিরকাল নবদ্বীপেই তীর্থ করতে আসেন, চৈতন্যদেবের আমল থেকে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপে প্রত্যহই ভক্তদের আগমন হয়ে আসছে। এই স্থান চৈতন্যদেবের জন্মভূমি না হলে এমনটি হত কি?

আর একটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। চৈতন্যদেবের আমলে নবদ্বীপ ছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্র; এখানে অসংখ্য টোল ছিল। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নবদ্বীপের এই গৌরব ছিল, কিন্তু তখন নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তীরেই অবস্থিত ছিল — তার অনেক প্রমাণ আছে। যদি বলা যায়, মিঞাপুর বা মায়াপুরে চৈতন্যদেবের বাড়ি ছিল, তা হলে প্রশ্ন উঠবে সেখানে কোন টোল ছিলনা কেন? কোন রহস্যময় কারনে মাঝখানের কোন একসময়ে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র সেখান থেকে বর্তমান নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়েছিল এরকম অনুমান আজগুবি কল্পনার পর্যায়ে পড়বে। বর্তমান নবদ্বীপে পোড়ামাতলা বলে যে স্থানটি আছে, তা খুবই পুরোনো এবং এই পোড়ামাতলার আশপাশেই টোলগুলি অবস্থিত ছিল।

অতএব এটা মনে করাই যুক্তিযুক্ত যে বর্তমান নবদ্বীপেই চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল। সম্ভবত বর্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমের কোন খাত দিয়েই তখন গঙ্গা বইত, পরে কোন এক সময়ে তা গতিপথ পরিবর্তন করে নবদ্বীপের পূর্বদিকের খাত দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌর-গৌরব

জনার্দন চক্রবর্তী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৈষ্ণবের প্রাণবিমোহন প্রেমাশ্রু বিধৌত মূর্তিটি জগতে প্রকটিত করেন। তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, অমানী মানদ মানুষকে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করল। বৈষ্ণব এর আগেও ছিলেন, চিরদিনই আছেন। 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' যে সূরির প্রত্যক্ষের বিষয় তিনি কতদিনকার, কে বলবে? বৈষ্ণবের হৃদয়গুহা হতে মধু-মন্ত্রের উৎসার। তাই তাঁর অনুভবে 'চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর'। তাঁর দর্শনে স্পর্শে ঘ্রাণে 'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো। তাঁর শ্রবণে কীর্তনে স্মরণে সেবায়, 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্'। তিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন, নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্'। বৈষ্ণবের চেতনাকে তিনি বিশ্বচেতনায় উদ্দীপিত করে তাঁর সত্তাকে পরম নিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 'কৃষি ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে' তাই অনতিদূরবর্তী কালের এই প্রেমদানরত ঐতিহাসিক দেবমানবকে বুঝতে চেয়েছিলেন লক্ষকোটি বুদ্ধিজীবী ও সরলবিশ্বাসী নরনারী বিশ্বম্ভর ভাগবত মহাবদান্যতার আলোকে। এ'দের মধ্যে ছিলেন গৃহী ও সন্ন্যাসী, নৈয়ায়িক ও বেদান্তী, স্মার্ত ও মীমাংসক, যোগী ও তন্ত্রাচারী, কিঞ্চন ও অকিঞ্চন, পাপী ও পুণ্যাত্মা। তাঁদের এই উপলব্ধি হরিপদ-দ্রবা ত্রিপথগার মতো সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক ও আধ্যাত্মিক, এই তিনটি ধারায় বয়ে এসেছিল পদাবলী সাহিত্যে, কীর্তন-গানে ও গোস্বামি-শাস্ত্রে। ঐতিহাসিক চেতনায় বিধৃত মনুষ্যমহিমাশ্রয়ী গৌর-গৌরব তথ্যে ও তত্ত্বে সুসমৃদ্ধ হয়ে সংস্কৃতে এবং বাংলায় এক বিশাল চরিত-সাহিত্যেরও সৃষ্টি করেছিল।

বৈষ্ণব পরতত্ত্বের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আমাদের মতো অসম্যগ্‌দর্শীর পক্ষে পরিপ্রশ্ন-নির্ভর বিদ্যাবিলাস (Scolasticism) মাত্র। স্বল্পাক্ষর, গূঢ়ার্থক, হৃদয়ের গ্রন্থিভেদক শ্রুতি স্মরণাতীত কাল থেকে বৈষ্ণব ও তাঁর উপাস্যের সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করে আসছে। 'অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম'। অস্তি, তিনি আছেন। ভাতি, তিনি শোভমান, সুন্দর। প্রিয়ম্, তিনি ভালবাসার বস্তু। তিনি শুধু তত্ত্ব নন, সাধ্য ও ভজনীয়। শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষৎ, স্মৃতিপ্রস্থান গীতা, ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রাত্মক বেদান্ত। তিন প্রস্থানেই এই শ্রুতির বিস্তার। 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'। পুত্র হতে প্রিয়তর, বিত্ত হতে প্রিয়তর, আর সব-কিছু হতে প্রিয়তর, অর্থাৎ প্রিয়তম। গোস্বামি-ব্যাখ্যাত চতুর্থ রসপ্রস্থান মহাপ্রভুর অনুভবেরই রসবিতান। আমাদের ধারণায়, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরের পঞ্চকোষে এই অনুভবের ক্রমোন্মোচন, ভজনরত ভক্ত-মানসিকতার স্তরবিন্যাস, শিক্ষাষ্টকের ভাষায় সর্বাত্ম-স্নপন।

'শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ'। এ ছয় গোসাই, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত, কবি-কর্ণপূর, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ বৈষ্ণব মনীষীর প্রজ্ঞাদীপিত শাস্ত্রচর্চায় এবং দৈন্যবিনয়-মণ্ডিত প্রেমপ্রত্যয়-স্নিগ্ধ জীবনচর্যায়, নরহরি চন্দ্রশেখর বাসুদেব শিবানন্দ লোচন বলরাম গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস নরোত্তম ঘনশ্যাম রাধামোহন বৈষ্ণবদাসের প্রাণদ্রাবী পদাবলীর উৎসারে ও আস্বাদনে, নবদ্বীপ নীলাচল ও বৃন্দাবনের ঐতিহ্য সমন্বয়ে এক অভিনব আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এই বিশেষ ধর্মসাধনা, ভজনপদ্ধতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি গৌড়ীয় আখ্যা বহন করেও গৌড়-বঙ্গের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে মিথিলা-মণিপুর আসাম-উৎকল মথুরা-বৃন্দাবন বারাণসী-প্রয়াগ গুজরাত-রাজস্থানের এক বিশাল ভক্তগোষ্ঠীর মর্মমূলে দৃঢ়প্রোথিত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর (খ্রীঃ ১৪৮৬- -১৫৩৩) পূর্বে 'শ্রী-মাধ্ব-রুদ্র-সনকাঃ চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় দক্ষিণে স্বতন্ত্র ভক্তিদর্শন গড়েছিলেন। রামানুজ, মাধ্ব আনন্দতীর্থ, নিম্বার্ক-প্রমুখ আচার্যের প্রবর্তনায় বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় ও দর্শন গড়ে উঠেছিল। ভক্তিভজনে সুপ্রাচীন আড়বাড়দিগের সাধনভজন ও নৃত্যকীর্তনের ধারা দাক্ষিণাত্যে সুচিরকাল বহমান ছিল। শঠকোপ যামুনাচার্য প্রমুখ আড়বার-ভক্তের তামিল ও সংস্কৃত সাহিত্যে দান ভক্তিজগতের অমূল্য সম্পদ। বোধ হয় এই জন্যেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরে নীলাচলে নীলাদ্রি-নাথ দর্শন করে দাক্ষিণাত্যের দিকে ছুটেছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং ব্রহ্মসংহিতার কিয়দংশ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ভাগবত-মাহাত্ম্যে ভক্তিদেবীর সহিত নারদের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিদেবী বলেছেন, 'উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা। ক্বচিৎ, ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং নীতা।' পূর্বোক্ত চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আগেও একায়ন, সাত্বত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, চতুঃসন প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু কিছু সাহিত্যের কথা জানা যায়। এঁদের সকলেরই উপাস্য অদ্বয় পরতত্ত্ব, 'পুরাণার্ক' ভাগবত যাকে ব্যক্ত করেছেন, 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' কারো উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ, কারো বা গোপাল-কৃষ্ণ, কারো ভজনীয় বাসুদেব, কারো বা রাধাকৃষ্ণ। এখানে স্মরণ করবার বিষয় কেদারবদরী হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল ভারতে যিনি অদ্বৈত-বেদান্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেন, জ্ঞানসাধনায় হিমালয়ের মতো তুঙ্গশির সেই আচার্য শংকরও আপন মনে গুন্ গুন্ করে 'ভজ গোবিন্দম্' সুরের আলাপ করতেন। বাংলার বিদগ্ধ ভক্তের নাম যেমন রাধাগোবিন্দ, দক্ষিণের মনীষী দার্শনিকও তেমন রাধাকৃষ্ণন্ নাম সগৌরবে বহন করেন। আচার্য শংকরের সুপ্রসিদ্ধ 'ষট্পদীস্তোত্রে' পাওয়া যায় 'সত্যপি ভেদাপগমে তবাস্মি নাথ ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ। - হে নাথ, তোমাতে-আমাতে ভেদ দূর হলেও আমি তোমারই, তুমি আমারই নও। তরঙ্গ সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গেরই নয়। বাংলার বেদান্তি-চূড়ামণি 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-কার মধুসূদন সরস্বতী তাঁর ভক্তি বিগলিত চিত্তের স্বত-উৎসারিত ছন্দোবাণীতে ভজনীয় বস্তুকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'বংশী বিভূষিতকরাণ নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদ্ অরুণবিম্বাধরোষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখাদ্ অরবিন্দ-নেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং ন জানে॥' বিদগ্ধ ভাগবত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর 'উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ' —গ্রন্থে এর রসাল পদ্যানুবাদ দিয়েছেন। 'বংশীকর পীতাম্বর বারিদবরণ, বিম্বাধর মনোহর নলিননয়ান। চন্দ্রমুখ চিতসুখ গোপীচিতচোর, কৃষ্ণ হতে পরতত্ত্ব জ্ঞান নহে মোর।' অদ্বৈতসিদ্ধি ও ভক্তিভজনের ভক্তজন বাঞ্ছিত সমন্বয়সাধন করে সরস্বতীপাদ বলেছেন, 'তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণং তস্যাং সাধনাভ্যাস-পাকতঃ। —আমি তাঁর, তিনি আমার, তিনিই আমি, এই তিন ভাবে ভগবানে শরণ নেওয়া যায়। সাধনাভ্যাসের ক্রমপরিণতির এ-গুলি স্তরভেদ। পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলেন, 'আমি তাঁহার, তিনি আমার, তিনিই আমি, এই তত্ত্ব মথুরা দ্বারকা ও বৃন্দাবনের সাধনরহস্য, সাধারণী সমঞ্জসা এবং সমর্থার সাধনসংকেত।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর উপাস্য গৌড়-কৃষ্ণ 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' অনুভব। 'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥' শক্তি ও শক্তিমানের অভেদে উপলব্ধির পথে এগিয়ে ,এর সঙ্গে আরও একটি সিদ্ধান্ত যোগ করে রাধাকৃষ্ণ-যুগল ভজনরত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাঁর উপাসাধারণায় সুস্থির হয়েছেন। 'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ-ভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।' কবিরাজ গোস্বামীর প্রাঞ্জল পয়ারে, 'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি। রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি'। ব্রজবুলি-পদরচনার রাজাধিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজ সুমধুর ঝঙ্কার তুলে পদাবলীর স্বচ্ছ প্রবাহে এই অনুভব বহিয়ে

দিয়েছেন,

'নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুরমুনিগণ-মনোমোহন ধাম ॥
জয় নিজ-কান্তা কান্তিকলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব বিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ ॥'

আমাদের কালের একজন গবেষণা নিপুণ সুধীর*মতে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ঐতিহ্যে এই অনুভবে বিভিন্নতা ছিল এবং গৌরভজনে ও কৃষ্ণভজনে উপায় ও উপেয়ের দ্বৈতভেদ ছিল। এই অনুমান নির্ভর সংশয়াত্মক সিদ্ধান্তটি আমরা বুঝতে পারিনি। চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসের রচিত পদাবলী বৃন্দাবনে জীব-গোস্বামীর কাছে পাঠানো হত এবং তাঁর আস্বাদনে রসোত্তীর্ণ হয়ে গৌড়মণ্ডলে প্রচারিত হ'ত। এ প্রসিদ্ধি অমূলক নয়। মুরারি গুপ্ত কবিকর্ণপুর এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামি-গ্রন্থ মিলিয়ে পড়লে এই অনাবশ্যক ভেদবাদ যে অমূলক, তা সহজেই বোঝা যায়। শুধু নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের নয়, নবদ্বীপ নীলাচল এবং বৃন্দাবনের ঐতিহ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নেই, বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে অধীতী বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দ এই মত পোষণ করেন।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব শ্রীরাধা শ্রীগৌরাঙ্গে একস্থ, এই সিদ্ধান্তের উপর আলোক সম্পাত করে মহাপ্রভুর গম্ভীরাবাসের নিত্যসঙ্গী অন্তরঙ্গতম পার্ষদ স্বরূপদামোদর শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছার উল্লেখ করে পরমার্থসম্পৃক্ত কাব্যরস (metaphorical Poetry) সৃষ্টি করেছেন।

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা--
স্বাদ্যো যেনদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ,
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥'

শচীগর্ভরূপ সিন্ধু থেকে শ্রীহরিরূপ চন্দ্র সমুদ্ভূত হয়েছিলেন তিনটি বাঞ্ছাপূরণের লোভে। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ এবং তিনি কিরূপে সেই প্রেম আস্বাদন করেন, (তার আস্বাদন বৈচিত্র্য) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণানুভবজনিত সুখ কত নিবিড়? লোকায়ত গানেও এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'আমি রাধা-ঋণ শুধিব গৌর-অবতারে।' শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গোপীদের বিশুদ্ধ প্রেমের ঋণ-পরিশোধ করতে পারেন এমন শক্তি তাঁর নেই।

'ন পারয়েহহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি, যা মাহভাজন দুর্জর-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।'. অকৃতীর অনুবাদে,

'আমারে ভজিয়া ছিঁড়িলে যেরূপে গৃহবন্ধন কঠিন ডোর।
প্রেমের বাঁধনে বাঁধিলে আমারে সুযশ তাহার ভুবন-ভোর।

কলঙ্কবিহীন সে অনুরাগের সাধ্য কি আছে দিব প্রতিদান,
নিজ অনুরাগে সাধিবে তোমরা অনন্য সে প্রেমের মান।'

বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ অবতার মাত্র নন, তিনি অবতারী। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। ব্রহ্মসংহিতার ভাষায় 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্'। এখানে সৎ (Existent), চিৎ (Conscious) এবং আনন্দঃ (Blissful), এই তিনটি কথা, এবং তদাতিরিক্ত বিগ্রহ-কথাটিও আছে। বিশেষ রূপে গ্রহণ করা যায় যার সাহায্যে তাই বিগ্রহ। এই বিগ্রহ (realisable) কথাটিকে ঘিরে বৈষ্ণবের বিশেষ আকর্ষণ। মহাপ্রভুর কথায় ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার, হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার'। যে যে শ্রুতি নির্বিশেষ প্রতিপাদন করেন সেই সেই শ্রুতি সবিশেষকেও স্থাপন করেন। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ৬৭-শ্লোকে ধৃত 'হয়গ্রীব-পঞ্চরাত্র' বচন উদ্ধার করা হয়েছে। 'যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষম সাসাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব'। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে অপ্রাণিপাদো জবানো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং তচ্চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্'। কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মুখে দিয়েছেন, 'অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জে পাণিচরণ। পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বত্র গমণ।। অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ। মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ।।' মহাপ্রভু এইভাবে সবিশেষ নির্বিশেষের সুন্দর সামঞ্জস্য করেছেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় মন ধরলে যিনি নির্বিশেষ অপ্রাকৃত ধরলে তিনিই সবিশেষ। গৌণীবৃত্তি লক্ষণীয় নির্বিশেষে, কিন্তু মুখ্যবৃত্তি অভিধায় সবিশেষ।

ভগবানের তিনটি শক্তি, পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অবিদ্যা। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, 'বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরে। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে।।' পরা শক্তির নাম চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি। অপরা শক্তির নাম অবিদ্যা, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি থেকে পৃথক। একে বলা হয় তটস্থা শক্তি। তট জলভাগ এবং স্থলভাগ কোনটির অন্তর্ভূক্ত নয়। স্বরূপ শক্তির তিনটি রূপ, হ্লাদিনী সন্ধিণী সংবিৎ, বিষ্ণুপুরাণের হ্লাদিণী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে।' চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর উক্তি 'সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয়, তিনরূপ।। আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী—যে শক্তির দ্বারা ভগবান সত্তাকে ধারণ করেন, দেশ কাল ও সর্বদ্রব্য যাতে প্রকাশিত হয় সেই শক্তি সন্ধিনী ভগবানের সত্তাসম্বর্দ্ধিনী শক্তি। 'তথা সম্বিদরূপোহপি যয়া সম্বেত্তি চ সা সংবিৎ।' --যে শক্তির দ্বারা তিনি জানেন ও জানান সেই শক্তি সংবিৎ। সংবিৎ তাঁর জ্ঞানবিচায়িনী শক্তি। 'তথা হ্লাদরূপোহপি যয়া সংবিদ্ধৎ কর্মরূপয়া তং হ্লাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্—চিৎ প্রধান যে শক্তির দ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন ও অপরকে জানান তাকে হ্লাদিনী বিবেচনা করতে হবে। হ্লাদিনী ভগবানের আনন্দ-সম্বর্দ্ধিনী বা প্রেমসম্বর্দ্ধিনী শক্তি। 'হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমা কাষ্ঠা নাম মহাভাব। মহাভাব-স্বরূপা রাধাঠাকুরাণী। সর্বগুণখানি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।' শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সিদ্ধান্তের আলোকে চরিতামৃতকার বলেন, 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে কভু যেছে নাহি ভেদ। রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ'।। ভগবানের এই অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তির সারভূতা প্রেমময়ী শ্রীরাধা। হ্লাদিনী শক্তিভূতা রাধার সহিত নিত্য-বৃন্দাবনে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার। প্রেমের পরম বিষয় শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। সেই রসাস্বাদনের পরম আশ্রয় শ্রীরাধা। দুইয়ে মিলে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি। শ্রীরাধা ভগবৎকোটি ও জীবকোটি উভয়ত্রই বিরাজ করেন। একদিকে ভগবানের প্রেমরস আস্বাদনের পরমাশ্রয় তিনি, অন্যদিকে জীবের প্রতি পরম করুণার বশে তাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করে অনুগৃহীত করেন। একদিকে তিনি কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্তির কারণ,

অন্যদিকে ভক্তিরূপে তাঁর জীবানুগ্রহ-প্রকাশ। এই যুগলিত রাধাকৃষ্ণ তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য তত্ত্ব। 'গোবিন্দ-লীলামৃত', বলেন, 'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ'। প্রসিদ্ধ শুকসারীর দ্বন্দ্বের রূপক আশ্রয় করে সেদিনও বাংলার যাত্রাকার এই অপূর্ব গভীর তত্ত্বের সংকেত দিয়েছিলেন,

'শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু ।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ ।।'

তত্ত্বতঃ অভিন্না হলেও শ্রীরাধা মাদনঘন-বিগ্রহা মহাভাবস্বরূপ না জানি, সে কেমন? শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্রয়-প্রেমরস আস্বাদনের সাধ মেটাবার জন্যে শ্রীরাধা তাঁর ভাব ও কান্তি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই পীতত্ত্ব বা গৌরবর্ণ সম্পাদন করেছেন। শ্রীরাধা কর্তৃক বহিরালিঙ্গিত 'অন্তঃকৃষ্ণ' তাই 'বহির্গৌর' হলেন। শ্রীরাধা নিখিল ভক্তকুলের শিরোমণি। শ্রীরাধার সঙ্গে একস্থ স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণ তাই রাধার ভক্তভাবটি অঙ্গীকার করলেন। শ্রীরাধা যেমন সখীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণাদির শ্রবনে কীর্তনে স্মরণে আত্মহারা, শ্রীগৌরাঙ্গও তেমন কৃষ্ণরূপ দর্শনে, এবং কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ শ্রবনে কীর্তনে ও মননে বিভোর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী গৌরকৃষ্ণই যে 'নন্দনন্দন গোপীজন-বল্লভ রাধানায়ক নাগর শ্যাম', তিনিই যে কান্তাপ্রেমের সর্বোল্লাসী সর্বোৎকর্মময় মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধা কর্তৃক প্রতি অঙ্গে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, গোদাবরীতীরে প্রথম সাক্ষাতে বিদগ্ধ ভক্ত রায় রামানন্দ রহস্য-গভীর এই অনুভবটি ব্যক্ত করেছিলেন।

'পহিলে' দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোহা দেখি মুই শ্যামগোপরূপ ।।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ।।

প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তার গৌরচন্দ্রিকার পদেও পাই, রাধাভাবে বিভোরা। বরণ হইল গোরা'। গৌরচন্দ্রিকার পদে তাই কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপবর্ণনায় কাঞ্চনের এত ছড়াছড়ি। 'বিমল হেম জিনি তনু, অনুপম রে', 'কষিতকাঞ্চন জনু নিরমল গোরা-তনু', 'চম্পক শোন কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু-লাবনি রে', 'কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগ অঙ্গ', 'কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরারূপ তাহে জিনি,' 'হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ', এমন অজস্র পদে সুবর্ণের দ্রব বয়ে গিয়েছে।

(সংক্ষেপিত)

—

চৈতন্য - প্রভা ও প্রতিভা

ডক্টর চিত্তরঞ্জন লাহা

মধ্যযুগে রেনে'শা কথাটি কষ্টকল্পিত হলেও চৈতন্যদেব তাঁর একক ব্যক্তিত্ব ও সাধনার মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জগতে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিলেন তাকে চৈতন্য-রেনে'শা নামে আখ্যা দিতে কোনো কষ্টকল্পনার সাহায্য নিতে হয় না। সেন রাজবংশের প্রশ্রয়পুষ্ট ও আশীর্বাদধন্য একটি অভিজাত সম্প্রদায় যখন দেশের বৃহত্তর জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত, বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে ভেদ বুদ্ধি যখন প্রবল ও প্রকট তখন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজ গঠনের পক্ষে এক অত্যন্ত আবশ্যক অথচ অনস্বীকার্য রূপেই অভিনব শক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। একই ঐক্য সূত্রে তিনি বাঁধতে চেয়েছিলেন নবদ্বীপের উচ্চ অভিজাত এবং উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাংলার অন্ত্যজ সমাজকে। তাঁর দৃষ্টিতে রূপগোস্বামী এবং যবন হরিদাস সমমর্যাদাবান। স্বীকার্য যে, কোনো সমাজতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এ কাজে ব্রতী হন নি। কিন্তু তাহলেও বাঙ্গালী নামক একটি জাতির গঠনপর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিলগ্নে তাঁর দান ও প্রভাবকে কোনো মতেই অস্বীকার বা তুচ্ছ করা যায় না। চৈতন্যদেব প্রচারিত সমন্বয়ের বাণীকে আধুনিক অর্থে Humanism বলতে অবশ্যই বাধা আছে, তবে একথা বলতে বাধা নেই যে, তথাকথিত Humanist-রা যে কাজ সংঘবদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নি চৈতন্যদেব তাঁর একক প্রয়াসে ও প্রভাবে সেই কাজ অনেক সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বিষ্ট সমাজে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অপূর্ব ও আশ্চর্য পথের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও যে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ রূপে অভিনন্দিত ও আখ্যায়িত হতে পারে চৈতন্য-দেবের পূর্বে সেকথা উচ্চারণ করাও অকল্পনীয় ছিল। অনেক পরবর্তীকালে মহাত্মাগান্ধী যাঁদের হরিজন বলে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জ্ঞাপন করেছিলেন আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, চৈতন্যদেবই তার প্রথম প্রবক্তা। মধ্যযুগে আর যাই থাক মানুষের মর্যাদা নামক বস্তুটি ছিল না। চৈতন্যদেবের কল্যাণেই মানুষ তার নিজস্ব মহিমা ও মর্যাদার আস্বাদ ও আনন্দ লাভ করল। অন্য কোনো অর্থ নয়, শুধুমাত্র এই অর্থেই 'কলিযুগ সর্বযুগসার'।

মধ্যযুগে ধর্মেরই প্রাধান্য ও প্রবলতা। চৈতন্যদেবও ধর্মসাধক। কিন্তু তাঁর ধর্মের বিশিষ্টতা ও বদান্যতা এখানেই যে, এই ধর্ম দেবতার পদতলে মানুষকে সভয়ে প্রণতিজ্ঞাপন করতে বাধ্য করে না। পক্ষান্তরে দেবতার সঙ্গে মানুষকে এক অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করে। এই স্নেহধারার আত্যন্তিক অনুশীলন ও অবগাহনে জাতির শৌর্য ও বীর্যের কতটা অবক্ষয় হয়েছিল সে প্রশ্নে না গিয়েও নির্ভয়ে এবং নির্ভুল ভাবেই বলা চলে যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মাদর্শ মানুষের কল্পিত স্বর্গের প্রাঙ্গন থেকে ভয় ও বিভীষিকার কণ্টকগুল্মকে নিঃশেষে উৎখাত করে সেখানে সদাপ্রসন্নময় প্রেম ও প্রীতির প্রস্ফুটিত পারিজাত পুষ্পটির সন্ধান দিয়েছিল। মধ্যযুগীয় কর্মকল্পনার এ এক অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। মানুষের ধর্মসাধনার ইতিহাসে চৈতন্যদেব যে এক বিস্ময়কর প্রতিভাধর পুরুষ সেকথা স্বীকার না করলে সত্যের প্রত্যবায় করা হয়।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মই সম্ভবতঃ প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেবার্চনার পথটি পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্তরের ভক্তিসাধনার আশ্রয় ও অবলম্বন রূপেই দেবতার পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করেছে। এতদিন আমরা শুনে আসছিলাম 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' সর্বত্রই একটি 'দেহি দেহি' ভাব। ভাবটা যেন এই, দেবতা তুমি আমাকে এইসব দাও এবং বিনিময়ে আমার

পূজা ও প্রণাম গ্রহণ কর। চৈতন্যদেব শোনালেন এক সম্পূর্ণ নূতন কথা। 'দেহি দেহি'-র পরিবর্তে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল—

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্ম-জন্মনীশ্বর ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এই 'অহৈতুকী ভক্তি' দেবতার রূপে এবং দেবার্চনার স্বরূপে এই অভিনব পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পথিকৃৎ রূপে চৈতন্যদেব নিঃসন্দেহে প্রাতঃস্মরণীয় এবং যুগান্তকারী এক অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ।

বস্তুতঃ মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক অভাবিত বিস্ময় ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় এবং সেই অধ্যায়টি নানাকারণেই গৌরবময় ও মহিমাময়।

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম একদিকে যেমন আচণ্ডাল সব মানুষকে একই ভাব-সাধনার ছত্র-ছায়াতলে একত্রিত করে মধ্যযুগের বিভেদ ও বিদ্বেষক্লিষ্ট সমাজে এক অদ্ভুত সাম্য ও সম্প্রীতির পথ নির্দেশ করল, বাঙ্গালীর অধ্যাত্মসাধনায় এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করল, অপরদিকে তেমনি সেই নূতন ভাবের জোয়ার-পুষ্ট পলিমাটিতে বাঙ্গালীর সাহিত্য ভূমিতেও এক নব সৃষ্টির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হল। স্বয়ং কবিগুরু স্বীকার করেছেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে দেশের মানসাকাশে ভাবের বাষ্প উদ্বেল ও উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং তাই তখন দেশের যেখানে যত কবির মন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সকলেই সেই ভাবের বাষ্পকে আকর্ষণ করে কত অপূর্ব ভাষা ও নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় তাকে দিকে দিকে বর্ষণ করেছিল। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিসাধনার পথ ও মত। এই পথেই প্রস্ফুটিত হল পদাবলী সাহিত্যের অপূর্ব ও অজস্র সম্ভার। এই ভক্তিসাধনায় মধুর রসের স্থান সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চে বলে এবং মধুর রস জীবনের সর্বাধিক প্রিয় ও প্রার্থনীয় বলে ভক্তির অমৃতধারায় শুধু দেবতার পাদপদ্ম স্নাত হল না, বাণীর কুঞ্জকাননটিও অপূর্ব সুর ও অনবদ্য সুরভিতে পরিপ্লাবিত হল। কবির ভাষাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে বলতে পারা যায় যে 'কীর্তন আর বাউলের গানে বাঙ্গালী দিল যে খুলি, মনের গোপনে নিভৃত ভবনে দ্বার ছিল যতগুলি'। বাংলা সাহিত্যের মরাগাঙ্গে দেখা দিল নব সৃষ্টির জোয়ার, পরিবর্তন ঘটল সাহিত্যের রূপে ও রসে। আখ্যায়িকা কাব্যের ক্লান্ত পথে দেখা দিল মধুর পদাবলী-গীতের মহোৎসব। এই মহোৎসবে অংশ নিলেন অজস্র কবি এবং তাঁদের মধ্যে প্রতিভার ইতরবিশেষ ঘটলেও উৎসাহে ও আয়োজনে কার্পণ্য ছিল না কারুরই। এঁদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক রুচির দরবারেও অপাংক্তেয় হয়ে যান নি। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস সেই অনেকের কয়েকজন, যদিও নামের তালিকা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। পদাবলী সাহিত্যের সুর ও ছন্দ বাঙ্গালীর প্রাণমনকে কতখানি অধিকার ও আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ আছে আধুনিক বাংলাকাব্যের পথিকৃৎ মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এবং শ্রেষ্ঠ পথিক রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, কাব্য ও কথার ভাঁজে ভাঁজে। পদাবলী সাহিত্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং চিরকালীন বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। একথা সত্য, সাহিত্যযশঃলিপ্সা এঁদের লেখনীকে উদ্বুদ্ধ করেনি ভক্তির অর্ঘ্যরচনার আবেগে, বোধকরি এঁদের অজ্ঞাতসারেই, এঁদের লেখনী বীণাপাণির বীণার তারে একটি অশ্রুতপূর্ব সুরের ঝঙ্কার তুলেছিল। সে ঝঙ্কার সাহিত্যমনস্ক মানুষকে আজও আনন্দ ও আস্বাদদান করে — এঁদের সৃষ্টির সার্থকতা এখানেই।

চৈতন্যদেব শুধু সাহিত্যের প্রেরণাদাতা নন, তিনি সাহিত্যের বিষয়ও। পদাবলী সাহিত্যের যে অংশটি গৌরচন্দ্রিকা নামে পরিচিত সেখানে গৌরাঙ্গ জীবনকথাই কাব্যগাথায় পরিণত। অবশ্য গৌরাঙ্গ

বিষয়ক এমন পদও আছে যেগুলি পারিভাষিক অর্থে গৌরচন্দ্রিকা নয় কিন্তু পদাবলীর বিশাল ও বিচিত্র নক্ষত্রমণ্ডলে সেগুলির দীপ্তি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে যথেষ্ট সক্ষম।

পদাবলী সাহিত্য একাধারে কাব্য ও গীতি। বাংলা গানের ভাণ্ডারে এগুলি এক অনবদ্য সংযোজন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কীর্তনগানেই বাঙ্গালীর হৃদয়াবেগ অপূর্বভাবে প্রকাশিত এবং তার সঙ্গীতবোধ নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত। রাগসঙ্গীত বা দরবারীসঙ্গীত কোনদিনই বাঙ্গালীর প্রাণের সম্পদ হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি যেমন বিশাল তেমনি জনপ্রিয়। রাগসঙ্গীত এবং লোকসংগীত মিলেমিশে কীর্তনগানে এমন একটা অপূর্বতা লাভ করেছে যে, তার আবেদন আদিকাল থেকে অদ্যতনকাল পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য ও অনন্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, "বাংলাদেশে কীর্তনগানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ"। আসলে কীর্তনগানে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে অন্য কোনো সঙ্গীতে তা সহজলভ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে, "বাঙ্গালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সঙ্গীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল"। পদাবলী তাই শুধু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, বাংলাগানকেও তার নিজস্ব রূপে ও রসে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল।

চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মাদর্শ শুধু দেবতাকে প্রিয় করেনি, প্রিয়কেও দেবতা করেছিল। ফলশ্রুতিতে যা দাঁড়িয়েছিল কবির ভাষায় তা হল এই যে, বাঙ্গালী ঘরের ছেলের মুখে বিশ্বভূপের ছায়া দর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব দর্শন তার সাহিত্যের সীমারেখাকে প্রসারিত করল, তার ইতিহাস চেতনাকে জাগ্রত করে তুলল এবং তার দর্শন চিন্তাকে করে তুলল উদ্দীপ্ত ও উজ্জাগর। বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত শাখাটির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনে স্বর্গের দেব-দেবীরাই সগৌরবে বিরাজমান ছিলেন, চৈতন্যদেবের কল্যাণেই মর্ত-মানবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সেখানে। শুধু বাংলাভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, সমগ্র নব্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের বিচারেও এ এক অভূতপূর্ব বিষয় ও বিস্ময়। মানুষের রচিত সাহিত্যে মানুষের মুখচ্ছবিটি এই প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে স্বর্গবাসীদের প্রস্থান-পর্বের প্রথম সূচনা এদিন থেকেই। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে জীবনচরিত রচনার যে ধারা শুরু হল তা অচিরে চৈতন্যদেব অথবা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য মানবমানবীর জীবন কথাকেও সাহিত্যের আঙ্গিনায় আমন্ত্রণ জানাল। শুধু যে বাংলা জীবনীসাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠল তাই নয়, বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ইতিহাস-বোধের উন্মেষ ও জাগরণ ঘটল। জীবনী রচনার সূত্রেই এই ইতিহাস বোধের উন্মেষ ও বিকাশ।

বাংলার দার্শনিক চিন্তাজগতেও চৈতন্যদেবের দান অপরিমেয় ও অনন্য। বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে।

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য বা বৈষ্ণব দর্শনের প্রাণপুরুষ যে শ্রীচৈতন্য সে সম্পর্কে দ্বিমতের আশঙ্কা কম। কিন্তু একথা ভাবলে ভুল করা হবে যে, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব শুধুমাত্র এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও এই দিব্য জীবনের প্রভাব নানারূপে ও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। মধ্যযুগের একটি শক্তিশালী সাহিত্যশাখা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের রূপ-রস ও রুচির যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার কারণও শ্রীচৈতন্য। সাহিত্যের রূপ ও রসগত পরিবর্তন শুধু নয়, রুচিগত পরিবর্তনের প্রবর্তনায়ও তাঁর দান অসামান্য। মঙ্গলকাব্যের দেবী চরিত্রগুলির বুকে যে কোমলতা এবং মুখে যে বরাভয়ের বচন দৃষ্ট ও শ্রুত হয় চৈতন্য পরবর্তীকালে তার

মর্মমূল অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের শ্রীচৈতন্যের কাছেই ফিরে যেতে হবে। মঙ্গলকাব্য একদা আখ্যায়িকা কাব্যের গণ্ডী অতিক্রম করে গীতিকাব্যের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল এবং এ বাবদেও বৈষ্ণবপদাবলীর নিগূঢ় প্রেরণাকে অস্বীকার করার হেতু নেই।

শুধু সমকালীন বা পরবর্তী সাহিত্য নয়, পূর্ববর্তীকালে রচিত সাহিত্যও নূতন অর্থ ও নবব্যঞ্জনা লাভ করেছিল শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিপ্রদীপে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি আজ আমরা যে অর্থে পাঠ করি স্বয়ং 'কবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি', এ অর্থ শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই আরোপিত এবং সেই সূত্রেই উপলব্ধ। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মিথিলার পণ্ডিতসমাজ বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির তুলনায় তাঁর হরগৌরী বিষয়ক পদগুলিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে থাকেন। মিথিলার পণ্ডিতগণের রসবোধ কম বলে ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করলে ভুল করা হবে। আসলে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি বাংলাদেশের পরিমণ্ডলে যে অর্থে পঠিত হয় সেই অর্থটি শ্রীচৈতন্যের দান। শ্রীচৈতন্যের আস্বাদনের সূত্রেই এই পদগুলি নব অর্থ-ব্যঞ্জনা এবং অমরত্ব লাভ করেছে।

বাংলার সাহিত্য-দর্শনে, গীতে-গানে, অভিনয়ে-আচরণে, সংস্কার-সংস্কৃতিতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে শ্রীচৈতন্যের কল্যাণে। কীর্তনগানের তিনি আদিপুরুষ, বাংলা যাত্রাগানের তিনি আদি প্রবর্তক এবং প্রধান প্রেরণা-দাতা। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে তিনি যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেছিলেন বাংলা যাত্রাগানের ইতিহাসে তা অদ্যাপি প্রাপ্ত ও জ্ঞাত প্রথম সংবাদ। পরবর্তীকালে বাংলা যাত্রগানের তিনিই প্রেরণা-পুরুষ এবং অনস্বীকার্যরূপেই শিরোনাম। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণযাত্রার যে বিজয়-বৈজয়ন্তী তার নেপথ্য-নায়ক তিনি। বহুক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং নায়ক এবং তাঁকে উপজীব্য করে রচিত ও অভিনীত নাট্যশালার বিজয়-রথের অগ্রগতি গিরিশযুগ পর্যন্ত অব্যাহত।

শ্রীচৈতন্যের অনুপম ও অত্যাশ্চর্য জীবন শুধু বাংলাদেশে নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পঞ্চসখা নামে পরিচিত পাঁচজন উড়িয়া কবি - বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস এবং অচ্যুতানন্দ দাস -- শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য ছিলেন। ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবত উড়িষ্যায় চৈতন্য-সংস্কৃতির অনির্বাণ দীপশিখা। অসমীয়া সাহিত্যেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। পূর্বভারতের আকাশে উদিত এই চন্দ্রের অপূর্ব-মনোহর এবং আশ্চর্য-স্নিগ্ধ আলোর দাক্ষিণ্যে যে মানস-বিপ্লব নিঃশব্দে সাধিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরার আশা দুরাশামাত্র।

চৈতন্য প্রভাবে বাংলার লোকসাহিত্য ও শিল্প

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর প্রভাবে এদেশের ধর্মে ও সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এদেশে ধর্ম ছিল, কিন্তু ধর্মচর্চায় কোন প্রাণ ছিলনা। লোকে বাইরের নিষ্প্রাণ আচার-অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করত, 'ধর্মকর্ম করে সভে এইমাত্র জানে'। শুধু তাই নয়, ধর্মের লক্ষ্য পারমার্থিক উন্নতি নয় — 'সমস্ত সংসার মত্ত ব্যবহার রসে' — কাজেই ধর্মচর্চার লক্ষ্যও ছিল 'ব্যবহারিক'। পূজা-আর্চায় কে কত আড়ম্বর করতে পারে কে কত ঐশ্বর্যের জাঁক দেখাতে পারে এইটেই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

চৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রাণহীন ধর্মে প্রেম-ভক্তির প্লাবন নিয়ে এলেন। ভক্তি প্রেমের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠল, 'দূরের ভগবান কাছের মানুষ' হয়ে উঠলেন। ভগবান ধরা পড়লেন অন্তরঙ্গ মানব-সম্পর্কের ভিতর। ঐশ্বর্যের আবরণ ভেদ করে পরম মধুর রূপে তিনি প্রকাশিত হলেন, ভগবান হলেন মানুষের প্রিয় সখা, স্নেহের সন্তান ও প্রেমাধীন প্রেমিক।

সমাজ সম্পর্কও এই প্রেমধর্মের সম্পর্কে সকল ভেদের প্রাচীর চূর্ণ করে মধুর হয়ে উঠল। গৌড়বঙ্গের সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল বিশ্লিষ্ট। 'পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।' যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা মূর্খকে অবহেলা করতেন। যাঁরা বংশ মর্যাদায় কুলীন তাঁরা অকুলীনজনকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যাঁরা ধনবান দরিদ্রকে তাঁরা ঘৃণা করতেন। 'বল্লালী বালাই' ছিল বড় বালাই। সকলের উপরে ছিল জাতিভেদ ও বর্ণভেদের নিগড়। শূদ্র, বিশেষ করে অধম শূদ্র, সমাজের চতুর্থ বর্ণের নীচে 'পঞ্চমবর্ণ' বলে গণ্য হত। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষাতো ছিলই না, এমন কি ধর্মচর্চারও কোন অধিকার ছিল না। শ্রীচৈতন্য এই অবজ্ঞাত মানুষের জন্য প্রচার করলেন এই বাণী — 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ'; তিনি ঘোষণা করলেন, 'কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার'। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও দরিদ্র জাতহারা ভিখারী শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভোজন করলেন, 'খোলাবেচা' শ্রীধরের হাতে জল খেলেন, শূদ্র-রামানন্দ মেঘে বর্ষণ করালেন বৈষ্ণবীয় সাধ্য-সাধন তত্ত্বের দর্শন।

মহাপ্রভুর এই সকল কর্ম সংসারের অপাংক্তেয়, চির অবহেলিত মানুষের জন্য পরম আশ্বাস বহন করে নিয়ে এল। সাধারণ মানুষ বুঝল, মানুষতো ছোট নয় — 'সবার উপরে মানুষ সত্য' — তাঁরও অধিকার আছে, সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে। ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিত বলেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম — 'bridged social gulfs and established a spirit of brotherhood' (Sir Jadunath Sarkar)। এই সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বন্ধনে ছোট-বড় যেন এক স্বর্ণশৃংখলে আবদ্ধ হল। ছোটর এই সামাজিক স্বীকৃতি লোকসাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টির সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলল।

লোকসাহিত্য ও লোকশিল্প বলতে জনসাধারণের সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকেই বোঝায়। সে সাহিত্য ও শিল্প উচ্চতর সাহিত্য ও শিল্প থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক। উচ্চতর সাহিত্যের নির্মাণকলা লোকসাহিত্যে থাকে না, থাকে না পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ও কৌশল। এ যেন স্বভাবকবির স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি—সরল, অনাড়ম্বর অথচ গভির ও মধুর। লোকসাহিত্য পুঁথির আঁখরেও ধরা থাকে না, মৌখিক সাহিত্যের আকারে শ্রুতি-বাহিত হয়ে লোকপরম্পরায় লোকসমাজে ছড়ানো থাকে।

লোকমুখের ছড়া, গান, গীতিকা, লোকনাট্য, যাত্রা ও প্রবাদ প্রভৃতি নিয়ে লোকসাহিত্যের আয়োজন। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে লোকসাহিত্যের এই সকল শাখায় বৈষ্ণবভাবের জোয়ার বয়ে গেছে। একদিকে যেমন রাধা-কৃষ্ণের বিষয় অপরদিকে তেমনই চৈতন্যের বিষয় এই সকল সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়েছে।

ছড়া নানাপ্রকারের হলেও, ছেলেভুলানো ছড়াগুলির আবেদনই মুখ্য। মাতৃহৃদয়ের অনন্ত বাৎসল্যের স্পর্শে এই ছড়াগুলো রস-মধুর। মায়ের কাছে শিশু যেন বাল গোপাল বা শিশু কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রূপ, গুণ, নৃত্যপর চাপল্য শিশুর মধ্যে আরোপ করে মা স্বর্গের দেবতাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন, আদর করে বলেন,

নাচো চাঁদের সোনা।
মুরলি গড়িয়ে দেব যত লাগে সোনা।

কখনও বা ধূলামাখা ছেলেকে ডেকে বলেন,

ধূলায় ধূসর নন্দ কিশোর
ধূলা মাখা গায়।
ধূলা ঝেড়ে কোলে নেব
আয়রে যাদু, আয়।।

চাঁদের সঙ্গে শিশুর রূপ যা অনাদি কালের। মায়ের কাছে কোলের ছেলে আকাশের চাঁদ। এই চাঁদের প্রত্যক্ষ রূপ মায়েরা দেখেছিলেন 'নদের চাঁদ' নিমাইয়ের মধ্যে। নদীয়ায় যেন সেদিন চাঁদের হাট বসেছিল। অনেকগুলো ছড়ায় এই চাঁদ ও চাঁদের হাটের কথা এসেছে শচীদুলাল গৌরাঙ্গের প্রভাবে ঃ

চাঁদ চাঁদ চাঁদ সোনার চাঁদ
হিণ্ডে বলে শচী।
আকাশে চাঁদ মাটিতে চাঁদ
চাঁদে চাঁদে মিশামিশি।।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে জাগে। গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মে, মানুষকে কখনও দেবতার আসনে বসানো হয় না। তত্ত্ব দৃষ্টিতে কৃষ্ণ দেবতা, চৈতন্যদেবও দেবতা। কিন্তু মায়ের স্নেহে দেবত্বে ও মানবত্বের ভেদ ঘুচে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি।' (লোকসাহিত্য ঃ ছেলেভুলানো ছড়া)।

পল্লী গীতিকাগুলিতে এই সত্য আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ময়মনসিংহ গীতিকার নায়কদের নাম 'নদ্যার চাঁদ', 'চাঁদ বিনোদ'। চৈতন্য প্রভাব যে সুদূর পল্লী অঞ্চলে কত গভির ভাবে লোকমানসকে আলোড়িত করেছিল এই নামগুলি তারই প্রমাণ বহন করে।

লোকসাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতেরও নানা প্রকারভেদ আছে— কোন গান আনুষ্ঠানিক, কোন গান আধ্যাত্মিক, কোন গান বা প্রেমসম্পর্কিত। লোকসাহিত্যের বিখ্যাত

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "সমগ্র বাংলার প্রেমসঙ্গীত রাধাকৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত" (বাংলার লোকসাহিত্য)। চৈতন্য-পূর্বযুগে অবশ্য লৌকিক প্রেমসঙ্গীত বৈষ্ণবভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। লৌকিক প্রেমসঙ্গীতে বৈষ্ণব প্রেমের স্পর্শ লেগেছে বিশেষ করে চৈতন্য-প্রভাবে। মানবীয় প্রেমে আরোপিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাবরূপ। নায়ক যেন কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ, যার প্রেমে রয়েছে অশেষ দুঃখ ও অশেষ মাধুর্য। নায়িকা রাধার মতই কৃষ্ণ প্রেমে বিভোলা। বিশেষ করে কুমারীর প্রেমে ও পরকীয়া প্রেমে ঘুরে ফিরে বার বার করে এসেছে দুঃখ ও কলঙ্কের কথা। পল্লী নায়িকারা তাঁদের প্রেমিকের হাতে কৃষ্ণের বাঁশীটি তুলে দিয়েছেন। সে বাঁশীর ধ্বনি ঘরের মর্যাদা, কুলের মর্যাদা ভুলিয়ে নায়িকাকে আকর্ষণ করে। পূর্ববঙ্গের ঘাটু গানে নায়িকার কথায় এই সুরটি বেজে উঠেছে,

কি বংশী বাজাইলা গো সই, দুষমণ কালাচাঁদে।
আমার চউখের পানি ঝুইড়্যা পড়ে
পরাণ কেবল কাঁদে ॥

কথনও বা শোনা যায়,

শ্যামের বংশীর সুরে মন উদাসী
ঘরে রইতে পারি না।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ব্রজের বংশীধ্বনিকে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রাম বাংলার সকল স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে। নায়িকা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সকলেই নায়ককে বৈষ্ণবপদের 'শ্যামবন্ধু' বা 'পরাণবঁধু' সাদৃশ্যে 'বঁধু' বা 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছে। গ্রাম-বাংলা সাজুতি 'মইষাল বন্ধু'-কে বলেছে,

নদীর ঘাটে দেখাশুনা কঙ্খেতে কলসী।
পাগল কইর‍্যা গেছেরে বন্ধু, তোমার
ঐ না মোহন বাঁশীরে,
বন্ধু, ঐ না মোহন বাঁশী ॥ (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড)

'আন্ধা বন্ধু'-র বাঁশীর সুরে পাগল হয়েছে রাজার দুলালী, মুখে বলেছে,

মুখের বাঁশী বুকে আমার চিকন দাগ কাটে।
সে বাঁশী ভুলিতে বন্ধু হিয়াখানি ফাটে ॥

পশ্চিমবঙ্গের 'ঝুমুর', উত্তরবঙ্গের 'ভাওয়াইয়া', জারি-সারি গান — সবই বৈষ্ণবের বাঁশীর সুরে সাধা। এই সুরে পাগল হয়ে মুসলমান কবিরাও অসংখ্য গান বেঁধেছেন, যার ভিতর বৈষ্ণবভাব তথা চৈতন্যভাবকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। যেমন লালমামুদের এই গান—

সোনার মানুষ নদে এলরে।
কত লোহার মানুষ সোনা হল
গৌর অবতারে ॥

স্যার গুরুসদয় দত্ত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলা থেকে যে 'পটুয়া' সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন, তাতেও অন্যান্য লীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার গান পাওয়া যায়। পটুয়ারা চিত্রপট দেখিয়ে

এই গান করে থাকেন। পটুয়া সঙ্গীতের ধারা প্রাচীন হলেও এগুলি পাওয়া যাচ্ছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে। ষোড়শ শতকের শেষভাগে মল্লরাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর থেকেই মল্লভূমিতে বৈষ্ণবতার ঢেউ লাগে। এই তরঙ্গ গ্রাম বাংলার পটুয়াদের অন্তরেও আন্দোলন সৃষ্টি করে। 'পটুয়া সঙ্গীত' সেই বৈষ্ণব তরঙ্গের কলতান। এই সঙ্গীতে কৃষ্ণের জন্ম, পূতনা বধ, কালীয় দমন, রাসলীলা প্রভৃতির নানা উপাখ্যানের প্রসঙ্গ রয়েছে। সব গানেই ঘুরে ফিরে এসেছে এই ধরনের পদ—

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' — সংগ্রহে এই ধরনের একটি ছড়া উদ্ধার করেছেন। মনে হয় এটি কোন পটুয়া সঙ্গীত থেকেই সংগৃহীত—

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইতে গোবিন্দ॥
ক্ষীর খিরয়ে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা।
নুটিয়ে নুটিয়ে খায় যত গোপের বালা॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে।
তাদের হাতে নড়ি কাঁধে ভাঁড়—
নাচে থেয়ে থেয়ে॥ [ছেলেভুলানো ছড়া (২)]

পটুয়া সঙ্গীতে গৌরাঙ্গের প্রসঙ্গও এসেছে। এ গৌরাঙ্গ নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ নীলাচল-চৈতন্য নন। গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে নদের নিমাইকেই জানত, গানেও এসেছে সেই প্রসঙ্গ। নিমাইর জন্ম, পাঠশালায় শিক্ষা, গদাধর পণ্ডিতকে ষড়্ভুজ মূর্তি দেখানো, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতির বর্ণনাই মুখ্য। গ্রাম্য লোকের বিশ্বাসই এই সকল গানে প্রধান হয়ে উঠেছে :—

কলিযুগে অবতার করিলেন দুটি ভাই।
কৌতুকে ধরিল নাম চৈতন্য-নিতাই॥

শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কাঁদিয়ে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ পল্লীর নিরক্ষর কবিদের অন্তরকে বেদনা-বিধুর করে তুলেছে—

রাত্রি প্রভাত হইল কোকিলে কাড়ে রা।
শয়নমন্দিরে ছিলেন শচীমাতা
ঝোড় তোলেন গা॥
কেন জন্ম নিলিরে বাপ নিমবৃক্ষমূলে।
হয়ে যদি মরিতি না করিতাম কোলে॥
কাল তোরে দিলাম বিয়া কুলীনের ঝি।
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার উপায় হবে কি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা দেখুন কাঁদিতে লাগিল।

লোকসঙ্গীতের একটি দিক সমৃদ্ধ করেছে বাউলগান। বাউলগান আধ্যাত্মিক সঙ্গীত হলেও জীবনের পাওয়া-নাপাওয়ার বেদনায় মাটির বেদনাকেই স্পর্শ করেছে। বাউলের সাধ্যবস্তু 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষের খোঁজে বাউলের যাত্রা। তাঁদের সাধন-পদ্ধতিও রহস্যময়। মনীষী অক্ষয় কুমার দত্ত বাউল সম্প্রদায়কে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিকৃত রূপের মধ্যে গণ্য করেছেন। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—প্রথম ভাগ)। একদিক থেকে বাউলদের সহজিয়া বৈষ্ণব শাখার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যদিও তাদের ভিতর তান্ত্রিক ও সুফীদের মত ও পথের বিষয়ও দুর্লভ নয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর Obscure Religiuos Cults গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'বাউল' সম্প্রদায় প্রাচীন হলেও চৈতন্য পরবর্তী-যুগেই এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এদের ভিতর কেউ হিন্দু, কেউ বা মুসলমান। হিন্দু বাউল অধিকাংশ বৈষ্ণব পন্থী, আর মুসলমান বাউল সুফী পন্থী। কিন্তু মুসলমান বাউলদের গানেও বৈষ্ণবতার প্রসঙ্গ রয়েছে। লালন ফকীরের-গানে একাধিক স্থলে চিকণকালা 'কৃষ্ণ' কিংবা 'গোরা'কেই 'মনের মানুষ' বলা হয়েছে। লালনের এই গানটি খুবই বিখ্যাত—

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা॥

আর এক মুসলমান কবি গেয়েছেন,

জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥ (আকবর শাহ)

আধুনিক বাউলগানের একটি সুবিখ্যাত পদ—

এলোরে চৈতন্যের গাড়ী সোনার নদীয়ায়।

চৈতন্যের কীর্তন ও আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ যেমন বাউলগানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই তাঁর 'প্রেমধর্ম' তির্যকভাবে বাউলিয়া সাধন-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। নরহরি সরকার ঠাকুর প্রচারিত 'গৌর নাগর' ভাবের ভজন লোচন-ধামালির ভিতর দিয়ে সহজভাবের পরিপোষকতা করে বাংলার বাউল সম্প্রদায়ে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বৈষ্ণবের 'রাগাত্মিক' সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে বাউলিয়া মতের নিশ্চিত যোগ লক্ষ্য করা যায়।

লোকনাট্য বা যাত্রাকেও প্রভাবিত করেছে বৈষ্ণব ধর্ম। এটিও লোকসাহিত্যে চৈতন্যদেবের দান। যাত্রা হচ্ছে লোকবৃত্ত অনুকরণাত্মক অভিনয়ের লৌকিক রূপ। চৈতন্য-পূর্বযুগেও যাত্রার প্রসার ছিল। গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে মুক্তাঙ্গন অভিনয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (১৭৪ সংখ্যার শ্লোক)। চৈতন্যদেবের সময়েও যাত্রার প্রচলন ছিল। চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বাল্যকালে খেলাছলে এই ধরনের যাত্রা করতেন। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণযাত্রার নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে বাংলায় যাত্রামাত্রকেই বলা হত 'কালীয়দমন' বা 'কৃষ্ণযাত্রা'। এই যাত্রার যে স্পষ্টভাবেই চৈতন্যের প্রভাব পড়েছে, তার প্রমাণ—এই যাত্রাগানের পূর্বে 'গৌরচন্দ্রী' গাওয়া হত অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্মরণ করেই কৃষ্ণযাত্রা শুরু হত। ডঃ সুশীল কুমার দে বলেন, "These Yātrās were preceded by the recitation on singing of a Gaurachandri—a term which unmistakably connects with Gaurachandra or Chaitanya." (Beng.

Lit. in the nineteenth century, Chap. XII) । ভারতীয় নাট্যমঞ্চের (The Indian Stage) ইতিহাস লেখক হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তও বলেন, 'এই মঙ্গলাচরণ বা গৌরচন্দ্রিকা হইতেই যাত্রাগানে চৈতন্য-দেবের প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।' (সাহিত্যের কথা : যাত্রার ইতিবৃত্ত)। পরে অবশ্য লোচন অধিকারীর আমল থেকে 'নিমাই সন্ন্যাস পালাও যাত্রার আসরে গান করা হত।

লোকসাহিত্যের আর এক অঙ্গ প্রবাদ-প্রবচন। লোকমুখের জ্ঞানগর্ভ বাক্যই প্রবাদে পরিণত হয়। চৈতন্য-পরবর্তীকালের বাংলা প্রবাদে চৈতন্যও স্থান পেয়েছেন। 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দটিই একটি প্রবাদ, অর্থ ভূমিকা। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম নিয়েও কতকগুলি প্রবাদ গড়ে উঠেছে যেমন—

১। ঘরে বাইরে একমন তবে হয় কৃষ্ণভজন।

২। ভজনের বেলায় খোঁজ নাই ভোজন ছত্রিশ জাতে।

৩। রসের ঘরেই গৌর নাচে।

৪। বোষ্টম হবার বড় সাধ।
তৃণাদপি শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ ॥

৫। ভক্তিহীন ভজন লবনহীন ব্যঞ্জন।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব শুধু লোকসাহিত্যকে নয়, লোকশিল্পকেও নতুন প্রেরণায় উম্বুদ্ধ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে জাতি-বর্ণের কোন ভেদ ছিল না। সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণী এই ধর্মে বিশিষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে। আমাদের দেশের লোকশিল্পের নির্মাতা বেশীর ভাগ এই অবহেলিত শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা চিরকাল অর্থবান লোকেদের নির্দেশে পরমুখাপেক্ষী হয়ে শিল্পীর কাজ করে এসেছেন। শিল্পকর্মে স্বাধীনতা ছিল কম। মুসলমান বিজয়ের পরে কয়েক শতাব্দী তাঁরা মুসলমানী শিল্প-প্রকৃতিকেই অনুসরণ করে আসছিল। দেশের নিজস্ব শিল্পকলা অনেকটা আচ্ছন্ন ও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। চৈতন্যের আবির্ভাব এই শিল্পকলায় একটি নতুন চেতনা সঞ্চার করল। এদেশের গ্রামীন শিল্পীরা সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় বৈষ্ণব পুরাণের বিষয়কে নতুন ভাবে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের যাঁরা পোষ্টা তাঁরাও একই ভাবে ভাবিত হলেন। ফলে পোষ্টা ও পোষিত, চিন্তা ও কর্ম, ভাব ও রূপ যেন এককেন্দ্রিক হয়ে উঠে বৈষ্ণবতার ভাবকে বিকশিত করে তুলল।

এই প্রসঙ্গে বিষেশভাবে স্মরণীয় বাংলার স্থাপত্য কর্মে টেরাকোটার অলঙ্করণ। পোড়ামাটির অলঙ্করণ খুব প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও টেরাকোটায় মূর্তি প্রতিকৃতি মুসলমান আমলে একরকম লুপ্তই হয়ে যাচ্ছিল। বঙ্গদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বঙ্গের গ্রামীন শিল্পীরা আবার টেরাকোটা শিল্পকে জাগিয়ে তুললেন। অন্যান্য মূর্তির সঙ্গে বৈষ্ণব কাহিনীগুলি পোড়ামাটির-ভাস্কর্যে সজীব হয়ে উঠল। এ বিষয়ে বঙ্গের মল্লভূমির মল্লরাজাদের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা বৈষ্ণব মনে দীক্ষিত হয়ে যে-সকল মন্দির নির্মাণ করালেন, তাতে পোড়ামাটির ভাস্কর্য বৈষ্ণব ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্তম্ভে, খিলানে, মন্দিরের প্রবেশদ্বারে শোভা পেল পোড়া ইটের সীমিত আয়তনে কালীয় দমন, নৌকাবিলাস, রাসলীলা প্রভৃতি 'বৈষ্ণবলীলা'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টায় বিভিন্ন জিলার 'পুরাকীর্তি' বিষয়ক যে পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম মানুষের ভিতর কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। প্রেমের স্পর্শে জড়ধর্মী পোড়ামাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই সময়কার খোদাইকরা কাঠের মূর্তি এবং মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব, রাধাশ্যাম, লালজী প্রভৃতির মূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

চিত্রশিল্পেও এসেছিল নতুন প্রাণ। মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে চারশ বছর আগেকার বৈষ্ণবদের চিত্র, সপার্ষদ চৈতন্য প্রভৃতি যে চিত্রগুলি এখনও দেখা যায়, তাতে রঙে-রেখায় ভাব যে কত জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তা অনুমান করা সম্ভব। স্যার গুরুসদয় দত্ত বীরভূম থেকে আবিষ্কার করেছেন বহু একক পট ও জড়ানো পট (Scroll-painting)। গান সহযোগে পট দেখিয়ে জীবিকা অর্জনের প্রথাটি প্রাচীন। সেই ধারার প্রাণময় পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায় বীরভূমের গ্রাম্য পটুয়াদের জড়ানো পটে। কালীয় দমন, পূতনা বধ, গোষ্ঠলীলা, বস্ত্রহরণ, রাস — নানাবিষয়ে কৃষ্ণলীলার ছবি এই সকল পটে অঙ্কিত হয়েছে। কাপড়ের উপর দেশজ রঙে-আঁকা এই পট নিশ্চিত প্রশংসার দাবী রাখে। এই পটগুলির ভিতর নিতাই-গোরার নগরকীর্তনের যে ছবিটি আঁকা হয়েছে, তা উচ্চতর শিল্পকলার নিদর্শন। এখানে ছবিই যেন কথা বলে উঠেছে—

গোরা নাচে আপন মনে
ধরে হরির নাম দিচ্ছেন বালকগণের কানে।
কলিযুগে অবতার করিলেন দুইটি ভাই
কৌতুকে ধরিল নাম চৈতন্য-নিতাই।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ-অনুধ্যান

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র কুমার দেবনাথ

॥ ১ ॥

মর্ত্যের মৃত্তিকা মাঝে মাঝে স্বর্গের মাধুরীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী প্লাবিত হয় প্রেমের বন্যায়, যুগযুগ সঞ্চিত মালিন্য-কালিমা বিধৌত হয়ে যায় সেই মন্দাকিনী ধারায়, পুঞ্জীভূত অন্ধকার অপসৃত হয় এক দিব্য আলোকের ঝর্ণাধারায়, মাটির ধরণীতে রচিত হয় অমরাবতী। তেমনি এক অঘটন ঘটেছিল — আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে — এক অবিস্মরণীয় আলোকোজ্জ্বল দিব্য আবির্ভাবে — এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন এই পুণ্য ভারত-ভূমির শ্রীধাম নবদ্বীপে : প্রেমের ঠাকুর নেমে এসেছিলেন হিংসা-বিদ্বেষ জর্জরিত এই ধূলার ধরণীতে। আর তাঁর দিব্য জীবনের আলোকে বহুযুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয়েছিল বিদূরিত, তাঁর প্রেমের প্লাবনে সমাজ-জীবনের সমস্ত কালিমা-মলিনতা বিধৌত হয়ে গিয়েছিল, জনজীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এক নতুন ভাবের বন্যায়, এক নব-আলোকের স্রোতোধারায় ; এক নতুন জীবনে জেগে উঠেছিল এই দেশ – 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এই রঙ্গ।' 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি নারায়ণঃ' — এই নবশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রেম-মৈত্রীর এক নতুন জীবনে হয়েছিল মানুষ উত্তীর্ণ। আর ঐ যে মরমী ভক্ত কবির উদাত্তকণ্ঠে শোনা গিয়েছিল—

> 'প্রেমধন বিলায় গোরা রায়
> প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়
> (ঐ) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' -

সে কি শুধুই কল্পনা বিলাস, আর শুধুই কি নদে-শান্তিপুর ? সারা গৌড়-বঙ্গ কি সেই প্রেমের প্লাবনে ডুবু ডুবু হয়ে যায়নি এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতভূমিও কি সেই দিব্যপ্রেমের প্রভাবে এক নব জন্মলাভ করেনি ! ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তা চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। শুধু রসিক, ভাবুক, প্রেমিক ভক্ত চিত্তের দর্পণেই নয়, বুদ্ধিবাদী, মননশীল ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেও এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত। বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ তাই সগৌরবে ঘোষণা করেছেন — 'সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্যাবর্তের একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।' এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, সঙ্গীত - চিত্র ভাস্কর্য সর্বক্ষেত্রেই এই মহাজীবনের এক মহনীয় প্রভাব পড়েছিল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি-ঋষি রবীন্দ্রনাথের কথায় - 'বর্ষা ঋতুর মত, মানুষের সমাজেও এমন এক একটা সময় আসে — যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল'। তাই আমাদের ভাব-ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা জীবন-দর্শন সব কিছুই এক পরম রমণীয় ভাবরসে হয়ে উঠেছিল সঞ্জীবিত — এই দেবমানবের মহনীয় প্রভাবে অবিস্মরণীয় অবদানে।

বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই প্রেম সর্বস্বতার জীবন্ত প্রেম বিগ্রহের ও প্রেমদাতৃত্বের মূর্তিই অঙ্কিত করেছেন তাঁদের সৃষ্ট অনুপম পদাবলী সাহিত্যে। চৈতন্য-সমকালীন কবি পরমানন্দ দাস শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে পরশমণির সাথে তুলনা দিয়েও তৃপ্ত হতে পারেননি—

'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনারে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা ।
আমার গৌরঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়ারে
রতন হইল কত জনা ।।'

কামধেনু বা কল্পতরুর চাইতেও তাঁর অযোচিত প্রেম-বিতরণের রূপটি মরমী বৈষ্ণব কবি বড় করে দেখেছেন —

এ গুণে সুরভি সুর তরু সম নহেরে
মাগিলে সে পায় কোন জন ।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেম ধন ।।

কবি গোবিন্দদাস 'নটবর গৌর কিশোরে'-র যে রূপটি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছেন সেখানেও 'অবিরত প্রেম-রতন-ফল-বিতরণে অখিল মনোরথ পূর' - - এই জীবন্ত প্রেম বিগ্রহের মূর্তিটিই বড় হয়ে উঠেছে । আর একালের বৈষ্ণব-রসাবত্তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেনের অবিস্মরণীয় উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে — 'প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে', এই দিব্য প্রেম-ভাবের জীবন্ত বিগ্রহই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ।

॥ ২ ॥

আমাদের অন্তরের জিজ্ঞাসা এই জীবন্ত প্রেমবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ কী এবং তাঁর আবির্ভাবের মূল কারণ ও তাৎপর্যই বা কী ? চৈতন্য জীবনীকারগণ এবং তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্যগণ তথা ভক্ত-মণ্ডলীর সুস্পষ্ট অভিমত—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করে কলিযুগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । গ্রন্থরত্ন শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তো সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন—

'নন্দ পুত্র বলি যারে ভাগবতে গাই ।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি ।।'

তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মহাপ্রভুর সাড়েতিনজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের অন্যতম শ্রীল স্বরূপ দামোদরের শ্লোকাবলী তিনি উদ্ধৃত করেছেন । তার মধ্যে একটা শ্লোক এই—

রাধা কৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেবাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ।।

"শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকৃতি বা গাঢ়তম অবস্থা । শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি । শ্রীরাধা ও

শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা, কিন্তু একাত্মা হয়েও তাঁরা অনাদি কাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য আখ্যা ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। শ্রীরাধার ভাব শক্তির দ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি প্রণাম করি।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর মতানুসারে নাম সংকীর্তনের প্রবর্তন এবং পাষণ্ডীদের উদ্ধারের জন্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অভিমত — প্রধানতঃ নিজরস আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহাপ্রভুরূপে, নাম সংকীর্তন প্রচার তার আনুষঙ্গিক ফল। শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীগণের তথা শ্রীশ্রীমদন গোপালের আজ্ঞাদেশ নিয়েই তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থরত্ন রচনা করেছিলেন - এ তথ্য সর্বজনবিদিত। তাই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের যে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন — তা বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায়ের অভিমতসম্মত বলে মনে করা যেতে পারে। কবিরাজ স্বরূপ দামোদরের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যার মধ্যে গৌর-আবির্ভাবের মূল কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে-

> শ্রীরাধয়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
> স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
> সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
> তদ্ভবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে বিচিত্র মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে আনন্দ বা সুখ অনুভব করেন সেই আনন্দই বা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে শ্রীহরিরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে ব্রজের লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; সৎ, চিৎ, আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। সৎ-এর সন্ধিনী (অস্তিত্ব), চিৎ-এর সম্বিৎ (চৈতন্য) এবং আনন্দের হ্লাদিনী (আনন্দদায়িনী) এই তিনটি শক্তির তিনি পূর্ণতম প্রকাশ। হ্লাদিনী শক্তির আস্বাদনের জন্যই ভগবানে এই জগৎ-সৃজন-লীলা। এই হ্লাদিনীরই পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীমতী রাধা। তিনি মহাভাব স্বরূপিণী -

> "প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
> সেই মহাভাব রূপা রাধাঠাকুরাণী॥"

এই মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম-মাধুর্য আস্বাদনের জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর রূপে আবির্ভাব। শ্রীরাধার প্রেম জীবন্ত, শ্রীবৃন্দাবনের মাধুরীই বা কিরূপ গৌরচন্দ্র তাঁর দিব্যজীবনের প্রত্যক্ষ আচরণের মাধ্যমে তা জগৎকে দেখিয়ে গেলেন। তাইতো গৌর-পরিকর সমকালীন বৈষ্ণব কবি নরহরি সরকার ঠাকুর প্রাণের নিবিড় অকূতি দিয়ে এই সত্যটাকে চিরকালের জন্য প্রকাশ করে গেছেন—

> 'যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
> কেমতে ধরিতাম দে।
> রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
> জগতে জানাত কে॥

মধুর বৃন্দা-- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥'

॥ ৩ ॥

নীলাচল লীলায় শেষ বার বৎসর যে প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছিল তখন রাধাভাবে আবিষ্ট তাঁর কৃষ্ণবিরহের আর্তিই ছিল সর্বপ্রধান। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় তা ভক্তিসাহিত্যের এক চিরস্মরণীয় সম্পদ হয়ে রয়েছে--

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর যে উন্মাদ প্রলাপ॥

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন - প্রত্যক্ষদর্শীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁদের কড়চায় প্রভুর এই বিরহোন্মাদলীলা প্রকাশ করে গেছেন। আর এই লীলা যে কত গভীর গম্ভীর এবং সাধারণের অনাধগম্য তাও তিনি বলেছেন -- দৈন্য-বিনয়ের সঙ্গে --

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥

রাধা-ভাবে-ভাবিত গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল এবং কৃষ্ণতন্ময়তায় সর্বত্রই তিনি কৃষ্ণানুসন্ধান তৎপর। নদীদর্শনে তাঁর যমুনা-জ্ঞান, সরোবর দর্শনে শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড, পর্বত দর্শনে গিরিগোবর্ধন, বনদর্শনে বৃন্দারণ্য -- এইরূপ প্রভুর 'ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময়বাদ'। কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধা যেমন--

'স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্তি॥'

কৃষ্ণ-বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রভুও সর্বত্রই কৃষ্ণদর্শন করেছেন।

প্রভুর যথার্থ স্বরূপ তিনি কৃপা করে নিজেই উদ্ঘাটন করেছেন মধুর ভাবের পরম রসিক শ্রীল রায় রামানন্দের কাছে -- যিনি প্রভুর সার্ধ্বেতিনজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের মধ্যমণি স্বরূপ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

মধ্যলীলায় কবিরাজ গোস্বামী তাঁর হৃদয়স্পর্শী অনুকরণীয় ভাষায় অক্ষয় করে রেখে গেছেন — এই তত্ত্ব সন্দেশ। সাধ্যসাধন তত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনার শেষে রায় রামানন্দ প্রভুর কাছে নিবেদন করেছেন—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।।
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।।
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন।।
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার।।

রায় রামানন্দ তার হৃদয়ের আশ্চর্য অনুভূতির কথা প্রকাশ করে জানালেন — প্রথমে গোদাবরী-তীরে তোমাকে সন্ন্যাসী রূপে দেখেছি. আজ দেখছি তোমাকে নূতন রূপে। আজ আর তোমার 'সন্ন্যাসী' রূপ দেখছি না, দেখছি 'শ্যাম-গোপরূপ' শ্যাম-সুন্দর বংশীবদন রূপ। আর তোমার সম্মুখে স্বর্ণবর্ণের এক প্রতিমা দেখেছি যার গৌরকান্তিতে তোমার শ্যামবর্ণরূপ আচ্ছাদিত—

'পাইলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি-মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা।।
তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন।।

এই সব দেখে আমি বিস্মিত, মনে প্রবল সংশয় দেখা দিয়েছে। তুমি কৃপা করে এর কারণ প্রকাশ করে আমার মনের সংশয় অপনোদন কর। 'প্রভু বললেন তোমার কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম রয়েছে তাই তুমি সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করছো'—

'মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরণ।।'

রায় রামানন্দ সহজে ছাড়বার পাত্র নন —

'রায় কহে—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।।
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।।
নিজগূঢ় কার্য তোমার প্রেম অস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।।'

ভক্তের কাছে ভগবান তখন ধরা পড়ে গেলেন। ভগবান 'চতুর চূড়ামনি' সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমিক ভক্ত বোধহয় তাঁর চেয়েও চতুর। আর ভক্তের কাছে ধরা দিতে, আপন স্বরূপ প্রকাশ করাতেই তো ভগবানের সর্বাধিক আনন্দ। তাই প্রেম-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমিক-ভক্ত-শিরোমণি রায় রামানন্দের কাছে আপন স্বরূপ প্রকাশ করলেন ; শুধু প্রকাশ করা নয় — রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ যে একটি তাই দেখালেন তাঁকে—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইয়া স্বরূপ।
রসরাজ — মহাভাব দুই একরূপ ॥

এই অপূর্ব রূপ দর্শনে রায় রামানন্দ আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভু আপন শ্রীহস্ত স্পর্শে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন এবং :

'আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাদন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোনজন ॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেহোঁ না স্পর্শে অন্যজন ॥'

'অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ, নিখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের চরমতম প্রকাশ যে মাদনাখ্য মহাভাব', সেই মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধা — আর এই দুয়ের মিলিত রূপই যে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র তাই প্রভু নিজগুণে কৃপা করে দেখালেন রায় রামানন্দকে। এই অংশের আলোচনা প্রসঙ্গে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতত্ত্ববিদ শ্রীল রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয় বলেন — "রসরাজ মহাভাব — এই দুইয়ের অপূর্ব মিলনে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধা এ দুয়ের মিলনে এক অতি অনির্বচনীয় রূপ। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর শ্যামরূপ শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কান্তিদ্বারা প্রচ্ছন্ন নহে, শ্রীরাধার গৌর অঙ্গ দ্বারাই আচ্ছাদিত। প্রভু জানালেন — রামানন্দ, আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌর নহে। আমার প্রতি অঙ্গে গৌরাঙ্গী-শ্রীরাধা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাকে গৌর দেখায়। তিনিও ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অপর কাহাকেও কখনও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব দ্বারা আমার নিজের দেহমন বিভাবিত করিয়াই আমি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করিতেছি। ভঙ্গিতে প্রভু জানাইলেন — তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার গৌর অঙ্গ দ্বারা সর্ব অঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বমাধুর্য আস্বাদন করিতেছেন।"

রায় রামানন্দের মত প্রেমিক ভক্তের কল্যাণে জগতের সকলে প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যথার্থ-স্বরূপ অবগত হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

॥ ৪ ॥

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই নিবন্ধকার, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমর বাণীর শরণ নিয়ে বলি —

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
যে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥

তেমনি প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ অনুধ্যানের অনধিকার চর্চা করলাম — তজ্জন্য সাধু-সজ্জন-বৈষ্ণব চরণে ক্ষমা প্রার্থী। প্রেমের ঠাকুরের শুভ-আবির্ভাবের পাঁচ শত বৎসর পূর্তির পুণ্যলগ্ন সমাগত প্রায়। যে প্রেমের ঠাকুরের এমন অবারিত করুণা, যিনি প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ তাঁরই শ্রীশ্রীচরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি, প্রণাম সেই শুভ পুণ্য তিথিকে — যে তিথিতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এই মর্ত্য পৃথিবীতে।

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ।।'

তাঁরই শ্রীমুখের এই অমোঘ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ।।"

—এই মহাজন বাণী অন্তরে শাশ্বত রেখে কৃপাময়ের শ্রীচরণে জানাই -- তাপদগ্ধ মালিন্যগ্রস্ত জীবনের কোটি কোটি প্রণাম, আর প্রার্থনা করি দন্তে তৃণ ধারণ করে, -- হে গৌরচন্দ্র, হে কৃপাময় — তোমার প্রেম-ভক্তির কৃপাকনা দান করে আমাদের তৃষিত প্রাণ শান্ত কর, সার্থক কর, পবিত্র কর এ জীবন !

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ।।
নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ।।

শ্রীচৈতন্য - পরতত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ

ডক্টর দোল গোবিন্দ শাস্ত্রী

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনতত্ত্ব ক্রমশঃ সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া শেষে পূর্ণ বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দর্শনশাস্ত্র ও মৌলিক ধর্মশাস্ত্রের সহিত ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের তুলনাত্মক আলোচনা অবান্তর। কারণ সে সমস্ত শাস্ত্রে খুব জোর মুক্তি পর্যন্ত পন্থানির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মুক্তির পর যে আরও কিছু থাকিতে পারে, তার অবধারণা সে সমস্ত শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর বহু উর্ধ্বের ব্যাপার।

একটি পুষ্প পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিতে থাকে। যেমন, প্রথমে পুষ্পের কলি, তারপরে অর্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থা, তারপরে একটি একটি করিয়া পাপড়ি মেলিয়া সমস্ত পাপড়ি খুলিয়া যায়। এ অবস্থাতেও তার পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্বরূপের পরিচয় হয় না যে পর্যন্ত তার কেশরকোষে মধুসঞ্চিত হইয়া ভ্রমর সেই মধুপানরত অবস্থায় মৃদুগুঞ্জন না করে - ইহার পরই সেই পুষ্পের সৌরভরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করে। ইহাই পুষ্পের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। ঠিক এই প্রকারে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে যুগ যুগ ধরিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি স্তর সেই অনাদি সনাতন হইয়াও চির নূতন। অধ্যাত্মতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বও (Supreme Absolute Divinity) ঠিক এই ক্রম সোপান অবলম্বন করিয়া সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ স্বরূপ বা অবতারের আকার গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকশিত স্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বের পূর্ণতম বিকশিত প্রকাশ বা স্বরূপ।

সৃষ্টিতে পরতত্ত্বে প্রথম প্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। এই স্বরূপ নিশক্তিক, নিরাকার জ্যোতির্ময় প্রকাশ মাত্র। তার পরবর্তী প্রকাশ আদিদেব মহাদেব। এই প্রকাশে শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু বিলাসবৈচিত্র্য নাই। আরও একটু উন্নত প্রকাশ নারায়ণ স্বরূপ। ইহাতেও শক্তি অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীর সেবা পরিদৃষ্ট, কিন্তু সে সেবাতে বিলাসবৈচিত্র্য খুব অস্পষ্ট। পরবর্তী প্রকাশ রাম-সীতা। এই রাম-সীতা যুগল প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলাস আছে। কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। তারপরে শক্তিমান্ ও শক্তির বিলাসবৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে দ্বারকেশ কৃষ্ণের মধ্যে। এই প্রকাশ পরতত্ত্বের পূর্ণ স্বরূপ। কিন্তু এই শক্তিও শক্তিমানের বিলাসে ঐশ্বর্যই প্রধান। এখানে মাধুর্য নাই। ইহার পরবর্তী প্রকাশ মথুরেশ কৃষ্ণে। এখানে মাধুর্য আছে, কিন্তু তাহাও কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্যমিশ্র। এখানে পূর্ণতর প্রকাশ। শেষে কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই পরতত্ত্বের পূর্ণতম লীলাবিলাস মাধুর্যস্বরূপ প্রকটিত। এই মাধুর্য রসলীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে নিজে আস্বাদন করিলেন, কিন্তু সাধক জীব, সে এক কোটীতে একটি হইলেও তাহার সেই লীলারস আস্বাদনের কোন বিশেষ সুযোগ শ্রীরাধাকৃষ্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়কেই এক তনু লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই মিলিত তনুই আমাদের সদোপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে কলিহত জীবকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজরস মাধুর্য আস্বাদন করাইবার জন্য নবদ্বীপে শচীদুলালরূপে অবির্ভূত হইলেন আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন —

যদি গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা ব্রজরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥

মধুর বৃন্দা— বিপিন মাধুরী
রসের চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
প্রবেশ হইত কার।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলায় প্রেমভক্তির চরমরসনির্যাস আপামর জনসাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। জীবের পাত্রাপাত্র যোগ্যতা অযোগ্যতা কিছুই বিচার না করিয়াই শ্রীগৌরহরি নামপ্রেম ও ব্রজরসমাধুরী বিলাইয়াছেন।

আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন --

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।

সত্যই আজ সেই বাণী সার্থকরূপ গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই লক্ষ লক্ষ অভারতীয় বৈষ্ণবভক্ত শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম লইয়া খোলকরতালসহ হরিনাম সংকীর্তন করিতেছেন। এখন পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ভক্তিভরে উচ্চারিত না হইতেছে; এমনকি সাম্যবাদী দেশ রাশিয়া ও চীনদেশেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রসারলাভ করিয়াছে। সর্বশেষে শ্রীরূপগোস্বামীপাদর অনুসরণে প্রার্থনা জানাই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দন।।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্য

বিমলেন্দু সরকার

বেশ—অনেক বৎসর আগের কথা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর ভক্তজনের মনে নানা প্রশ্ন আন্দোলিত হচ্ছে। তাঁরা বহু পুঁথি, ইতিহাস আর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সমস্ত তথ্যের মধ্যে যথেষ্ট গড়মিল। তাই অনুসন্ধান চালালেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডাঃ রমেশ মজুমদার, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন আর সেই সঙ্গে এসেছেন কৃষ্ণপ্রেমী পরম বৈষ্ণব আফ্রিকার অধিবাসী রিচার্ডস সিরিল শঙ্কু প্রভু। ২৫/২৬ বছরের যুবক, প্রখর মেধাবী, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান, তিনিও এসেছেন মহাপ্রভুর দেহাবসান না অন্তর্ধান এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে।

ফরাসী পণ্ডিত রোমা রোঁলা ব্যক্ত করেছেন মহাপ্রভু মারা গেছেন মৃগীরোগে। রিচার্ডস সিরিলের মহাপ্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা -- যদি মহাপ্রভুর এপিলেপসিতে মৃত্যু হয় তবে নিশ্চয়ই তাঁর সমাধিক্ষেত্র থাকবে। পরমবৈষ্ণব রিচার্ডস সম্বন্ধে একটু বলি। বাল্যকাল হতে তিনি জানতেন যে, তাঁদের গ্রামের এক গরীব ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। বাবা, মা পাত্রী-নির্বাচন করেছেন আর রিচার্ডস এই বিয়েতে নিজের সম্মতি দিয়েছিলেন। পরে সহরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে এক ধনী কন্যাকে ভালবেসে ফেললেন। ভুলেই গেলেন গ্রামের সেই বাগদত্তা গরীব মেয়ের কথা। গ্রামের মেয়ে যখন জানলেন রিচার্ডস তাকে পরিত্যাগ করে ধনী কন্যাকেই বিয়ে করবেন, তখন সেই মেয়ে বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে আত্মহত্যা করে। রিচার্ডস কয়েক বছর পর গ্রামে এসে সেই মেয়ের আত্মহত্যার কথা জানলেন। তখন বিবেকের দংশনে আর অনুতাপে নিজেও কাঁদতে লাগলেন। ধনী-কন্যার দিকে আর ফিরেও তাকালেন না। প্রাণে তাঁর শান্তি নেই। সাক্ষাৎ হ'ল পাশ্চাত্যে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তি বেদান্তস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে। প্রভুপাদ তাঁকে শান্তির পথ দেখালেন। অহরহ কৃষ্ণনামে ডুবে থাকতে। রিচার্ডস মদ, মাছ, মাংস সব পরিত্যাগ করেছেন। গীতা আর চৈতন্য চরিতামৃত তাঁর কণ্ঠস্থ, প্রাণে এসেছে শান্তি। তিনি নীলাচলে এসে অনুসন্ধানে মহাপ্রভুর সমাধিক্ষেত্র পেলেন না। প্রশ্ন—দেহাবসান হ'লে অন্যান্য কৃষ্ণভক্তগণের মত তাঁরও সমাধিক্ষেত্র থাকবে। অনুসন্ধানে জানলেন মহাপ্রভু তাঁর জীবদ্দশার শেষ দিকে কাশীমিশ্র ভবনের গম্ভীরার মেঝেতে কৃষ্ণনামে ব্যাকুল হয়ে তাঁর নয়নাশ্রু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ অংকিত করে তাঁরই উপর নিজের মুখ ঘষছেন উন্মাদের মত আর বলছেন — বল কৃষ্ণ -- কোথায় গেলে তোমা পাব। মুখ, নাক ক্ষতবিক্ষত, তবুও বিরাম নেই। মহাপ্রভুর এই দৃশ্যকে পণ্ডিত রোমা রোঁলার ধারণা এপিলেপসিতে মহাপ্রভু মারা গেছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের শেষ নাই। ঐতিহাসিকের কাজই হচ্ছে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাহিরে মাটি খুঁড়ে আর পুঁথিপত্র হতে সত্য উদ্ঘাটন করা।

জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য মঙ্গলে লেখা আছে—"রথ বিজয়া নাচিতে, ইটাল বাজিল বামপায়ে আচম্বিতে"। চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে, সেই লক্ষ্যে তোটায় শয়ন অবশেষে। মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।

এর অর্থ রথ যাত্রায় সময় নাচতে নাচতে ইটের আঘাতে মহাপ্রভুর বাম পা জখম হয়। সেই ক্ষতস্থান পরে বিষাক্ত রূপ ধারণ করে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জ্বরের ঘোরে আশ্রয় নিলেন তোটা গোপীনাথে, আর সেখানে তাঁর দেহাবসান হয়। মনে প্রশ্ন এলো যদি মহাপ্রভুর এই ভাবেই মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর সমাধিক্ষেত্র নেই কেন ? তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হ'ল, না সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল, সে সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ নেই কেন ? নেই কেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। আবার 'চৈতন্য চরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন--

"থাকে যদি আয়ুশেষ
বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়"

এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর শেষ লীলা বা অন্তর্ধান বা সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া বা দেহাবসান — এ সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর।

লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে' জানতে পারি, সেখানে লোচনদাস বলেছেন—

"তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে,
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে" ॥

আবার প্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক উৎকলীয় কবি দিবাকর দাসের "জগন্নাথ চরিতামৃত" রচনায় জানা যায়—

এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন"।

এই তথ্যকে কেন্দ্র করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর ভক্তজনের শুরু হ'ল জ্ঞান অন্বেষণ। আর নীলাচলের তৎকালীন সমাজের, রাষ্ট্র ব্যবস্থার, আর দেশবাসীর মনোভাব সম্পর্কে তথ্য আহরণ। মহাপ্রভু যিনি কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর, তিনি বৃন্দাবন, দ্বারকা ছেড়ে নীলাচলে এসেছেন, মায়ের ইচ্ছাপূরণে।

তৎকালীন উড়িষ্যায় রাজত্ব করতেন গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব। যাঁর রণনৈপুণ্য আর শৌর্যবীর্যের প্রবল প্রতাপে যবন রাজা সেকেন্দার সহ বহু রাজা ভীত ছিলেন। এই সেকেন্দার বহুবার উড়িষ্যা আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রতাপরুদ্রদেবের প্রবল প্রতাপে সেকেন্দার ভয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করেন প্রতাপরুদ্রদেব মান্দারণ দুর্গের কাছে নবাব আলাউদ্দিন হোসেনের সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে অপূর্ব রণ কৌশলে পরাস্ত করে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তট পর্যন্ত দখল করে নিলেন। সেই প্রতাপরুদ্রদেবকে চৈতন্যদেব উপদেশ দিলেন —

'কৃষ্ণ কার্য বিনা তুমি না করিবে আর
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্তন।'

প্রতাপরুদ্রদেব রাজকার্য আর শাসন ভুলে নিমজ্জিত হলেন কৃষ্ণ ভক্তি রসে। তার তখন একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান কৃষ্ণনাম। ফলে একের পর এক দুর্গের পতন হতে লাগল। অন্যান্য রাজা আর সুলতানগণ প্রতাপরুদ্রদেবের সাম্রাজ্যের বহু অংশ ছিনিয়ে নিলেন। আস্তে আস্তে দক্ষিণে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটল। চৈতন্য বিরোধীগোষ্ঠী দেশের জনসাধারণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর জন্যই দেশের আর রাজার এই দুর্গতি, আর পরাজয়ের কারণ।

দেশের রাজপুরুষ আর চৈতন্য বিরোধীগোষ্ঠীর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান রাজাকে মহাপ্রভুর প্রভাব থেকে আর হরিনামে মাতোয়ারা হতে বিরত করতেই হবে।

মহাপ্রভুর জাতির প্রতি আহ্বান — তোমরা সব উচ্চ-নীচ আর অস্পৃশ্যতার গণ্ডি পেরিয়ে 'সব হিন্দু এক হও'। ব্রাহ্মণকেও কোল দিচ্ছেন আবার হাড়ি-মুচি-ডোম সকলকে হরিনাম আন্দোলনে আলিঙ্গন করছেন। তাঁর প্রভাবে জগন্নাথ মন্দিরে উচ্চ-নীচ সকলের সমান অধিকার। মহাপ্রসাদ এক পাত্র হতে উচ্চ-নীচ সকলেই একত্রে তুলে খাচ্ছেন। এতে মন্দিরের পাণ্ডা, পুরোহিতের একাংশ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ জেগেছে এই মহাপ্রভুর উপর।

এদিকে প্রতাপরুদ্রদেবের চার রাণীর মধ্যে এক রাণী পদ্মাবতী বীর সিংহ নামক এক বৌদ্ধের অনুগামী হয়ে বৌদ্ধ আদর্শে অনুরাগী হয়ে পড়েন। এর ফলে হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত সমাজ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। মহাপ্রভুর হরিনাম কীর্তনের প্রভাবে দেশের উচ্চ-নীচ সকলেই 'এক মন এক প্রাণ'। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আর কেউ আকৃষ্ট নয়। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরাও দেখলেন এই সুযোগে মহাপ্রভুর প্রভাব খর্ব করতে পারলে তাদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই কারণে বৌদ্ধরাও চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মেলাল।

মহাপ্রভু কৃষ্ণনামাবেগে আর ভাবের আবেশে নিমজ্জিত। তাঁর কাছে দোষী-নির্দোষী, শত্রু-মিত্র সকলেই সমান। সকলকেই শিব জ্ঞানে দেখছেন আর দুচোখ দিয়ে কেবল অশ্রু ঝরে — কোথা কৃষ্ণ — বল কোথা গেলে তোমা পাই।

এদিকে রায় রামানন্দের সহোদর প্রশাসক গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজ তহবিল তছরূপের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। এই গোপীনাথ পট্টনায়ক মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করছেন। মহাপ্রভু তাকেও কোল দিলেন ও সব অপরাধ ক্ষমা করতে বললেন। ফলে গোপীনাথ মুক্তি পেলেন। রাজ্যের শাসন কার্যে মহাপ্রভুর এমন অভাবনীয় প্রভাব দেখে, রাজ্য পরিচালনার কর্ণধার হতে দেশের বুদ্ধিজীবীমহল তথা জনসাধারণের একাংশ ক্ষুব্ধ — কি করে রাজাকে চৈতন্য প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায় তাই গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

মন্দিরের পূজারী এবং পাণ্ডাদের একাংশের মহাপ্রভুর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ -- এই মহাপ্রভুই যত সব ছোটজাত — হাড়ি-মুচি-মেথর যাঁদের এই পূজারী পাণ্ডারা ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখতেন, তাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়ে একাকার করেছেন, এই হরিনামের অমোঘ শক্তিতে। প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের একমাত্র ধ্যান — এই সুযোগে কি করে রাজাকে হটিয়ে রাজসিংহাসন দখল করা যায়। বঙ্গদেশের সুলতান যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করল তখন এই বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলতানের সঙ্গে হাত মেলায়। উদ্দেশ্য রাজার শক্তি খর্ব করে যদি রাজ সিংহাসনের অধিকার পাওয়া যায়। ভেতরে ভেতরে চারিদিক হতে ষড়যন্ত্র — এই মহাপ্রভুর প্রভাব খর্ব করতেই হবে।

প্রতি বছরের মত সেবারও নীলাচলে এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য, পুরীতেও তখন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, পণ্ডিত রঘুনাথ দাস, শংকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ লীলা সহচরবৃন্দ। এ'রা মহাপ্রভুর সঙ্গেই থাকতেন। কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করা মাত্র মন্দিরের পুরোহিতরা হঠাৎ মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন, তখন বেলা ৪টা।

মহাপ্রভুর সঙ্গে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হ'লনা। মন্দিরে প্রতিবারই মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে ভক্তবৃন্দসহ মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু কোনবারই সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি বা ভক্তবৃন্দকে প্রবেশাধিকার না দিয়ে কেবলমাত্র মহাপ্রভুকেই মন্দিরে প্রবেশ অধিকার দিয়ে তারপর রাত্রি ১১টায় অর্থাৎ সাত ঘন্টা পর পুরোহিতরা মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন আর জানালেন 'জগন্নাথে লীন হয়েছেন মহাপ্রভু'।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক আর ভক্তজনের অনুসন্ধান আর যুক্তির বিচার। এই সত্যানুসন্ধান আর যুক্তির কষ্টিপাথরে আর তৎকালীন সে দেশের পরিস্থিতি যা ইতিপূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক গবেষণাকে কেন্দ্র করে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে একমত হয়ে জানালেন—**We may, however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in Jagannath Temple when the priests apprehended his end to be a near. They shut the gate against all visitors.**

* তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট
সত্বরে চলিয়া গেল
অন্তরে উচ্চাটে ।।' (চৈতন্য মঙ্গল, লোচন দাস)

This they did to make time for burying him, within the temple. If he left the world at 4 P.M., the doors we know were kept closed till 11 P.M. This time was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11 P.M. opened the gate and gave out that Chaitanya was incorporated with the image of Jagannath. (Chaitanya and his age. p. 259—265)

ঐতিহাসিকের গবেষণামূলক অভিমত মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে বেলা ৪টা হতে রাত ১১টা এই ৭ ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের অভ্যন্তরে মহাপ্রভুকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলে মেঝে আবার ঠিকঠাক করা হ'ল। আর দেশবাসীদের জানান হ'ল যে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথে লীন হয়েছেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবও জানতেন গোবিন্দ বিদ্যাধর আর চতুর্দিকের দুষ্ট চক্রের ষড়যন্ত্রের কথা। কিন্তু তিনি তখন অসহায় ভীত, সন্ত্রস্ত। মন্দিরের পুরোহিতবর্গ যখন অপেক্ষারত ভক্তজনদের জানালেন যে মহাপ্রভু আর নেই, জগন্নাথে লীন হয়েছেন, তখন বৈষ্ণবগণ আকুলি বিকুলি করে কেঁদে উঠলেন।

'কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে' (বৈষ্ণব দাসের চৈতন্য চকড়া)

মহাপ্রভু আর এজগতে নেই. এই সংবাদে ভক্তগণ যেমন ক্রন্দন আর্তনাদ করছে, ওদিকে নীলাচলে সর্বত্র একটা ভীত, সন্ত্রস্ত ভাব। গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব পুরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন কটকে।

ঐতিহাসিকগণের অভিমত বহুবৎসর ভয়ে হরিনাম কীর্তন করেননি ভক্তজন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অভিমত সমর্থন যোগ্য। কারণ মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করার আগে মন্দিরের পুরোহিতগণ কি সবজান্তা ছিলেন যে মহাপ্রভু সেইদিনই জগন্নাথে লীন হয়ে যাবেন আর সেইজন্যই কেবলমাত্র সেইদিনই মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র ৭ ঘণ্টা ধরে সব দরজা বন্ধ করে রাখলেন ? ইতিহাসে একথা পাওয়া যায়না যে মহাপ্রভু পুরোহিতদের জগন্নাথে লীন হয়ে যাবার কথা গোপনে জানিয়ে ছিলেন।

ওদিকে মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের দুই পুত্রদের পর পর উড়িষ্যার রাজ সিংহাসনে লোক দেখান বসিয়ে ঘাতকের দ্বারা দুই রাজপুত্র হত্যা করে ঠিক এক বৎসরের মধ্যে রাজ সিংহাসন অধিকার করেন।

প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্য পরিচালনায় অসাফল্যের কারণ হিসাবে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর History of Orissa Vol. I P. 330, 331, 336 গ্রন্থে জানালেন **'Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa.**

অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেশের দুর্গতি। এটাই প্রতিপন্ন করলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম আর গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবকে অহরহ কৃষ্ণনামে ডুবে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন — সেই কারণেই কি মহাপ্রভু অপরাধী ? না — কখনই না। যদি দেখা যায় একজন ডাক্তার সার্জেনকে তার গুরুদেব অহরহ কৃষ্ণনাম জপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অপারেশন টেবিলে রোগীর অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করাই ডাক্তারের কর্তব্য। ডাক্তারবাবু যদি অপারেশনের সময় সব ছেড়ে কেবল কৃষ্ণনাম জপ করতে থাকেন সে ক্ষেত্রে গুরুর নির্দেশ দায়ী নয়।

গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবকে মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম জপ করতে নির্দেশ দিলেন, অর্থাৎ ধর্মপথে নিজেকে পরিচালিত করতে উপদেশ দেন। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় উদাসীন থাকতে নির্দেশ দেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিমুখ হয়ে অর্জুন বিষণ্ণচিত্তে নিশ্চুপ। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রপ্রয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন — কারণ এটাই ধর্মপথ।

মহাপ্রভু কৃষ্ণনামে তার ভাবের আবেগে নিমজ্জিত আর সেই সুযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী গোপীনাথ পট্টনায়ককে মহাপ্রভু কোল দিতে পারেন, কিন্তু শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত শাসককুল অপরাধীকে ছেড়ে দেবেন কেন ? বিচারকের কাছে সাধারণ মানুষ আর নিজ সন্তান অপরাধী হলে বিচারে সকলেই সমান। এখানে স্নেহ, ভালবাসা বা যে কোনও প্রভাব প্রতিপত্তির স্থান নেই।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে গান্ধীজী অভিমত প্রকাশ করলেন, ভারত খণ্ডিত হবার আগে তাঁর দেহ যেন খণ্ডিত করা হয়। কিন্তু জিন্না সাহেব বেঁকে বসলেন — হিন্দুদের সাথে মুসলমানেরা বাস করবে না। আর সেই জন্যই মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র চাই। চারিদিকে চলল হিন্দু নিধন। যে সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশে সারা বাংলা সহ কলকাতা জুড়ে হিন্দু নিধন চলল আর স্বাধীনতা ঘোষণার পর সুরাবর্দি সাহেবকে যখন দেশের যুব সম্প্রদায় মরিয়া হয়ে খুন করতে চলেছেন, সেই মুহূর্তে

সুরাবর্দি প্রাণ বাঁচানর জন্য গান্ধীজীর পায়ে পড়লেন। গান্ধীজী তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। এতদিনের সাধনা হিন্দু মুসলমান ঐক্য সব চুরমার হয়ে ভারত ভাগ হয়েছে। চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা। তিনি রামধুন প্রার্থনায় মগ্ন। সেই সুযোগে সুরাবর্দি গান্ধীজী পদপ্রান্তে আশ্রয় নিলেন। গান্ধীজী তাকে ক্ষমা করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে সুরাবর্দির বিচার হ'ল না কেন? গান্ধীজীর প্রভাব শাসনকার্যে প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত হয়নি শাসককুলের। বড় বড় রাষ্ট্র নায়কদের অপকীর্তির বিচার হয়েছে পরবর্তীকালে। ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। অথচ এই সুরাবর্দি ছাড়া পেয়ে পূর্ব পাকিস্থানে গেলেন। কথিত আছে মত্ত অবস্থায়, অন্তসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে লাথি মারেন। এই সুরাবর্দি বেইরুট হতে ২০ বছরের মেয়ে বিয়ে করে দেশে ফিরলেন। জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত ভাগ করেছেন, সেই খণ্ডিত পূর্ব পাকিস্থানে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তার মনের কি এতটুকু পরিবর্তন হয়েছিল? ধর্মীয় আদর্শ মানুষকে দেয় দেবত্ব। অন্যায় হতে বিরত করে আর দেশের শাসন অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করে।

শিবাজী রাজকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর গুরু রামদাস এলেন। গুরুর নির্দেশে শিবাজী সমস্ত রাজত্ব গুরুদেবের পায়ে সমর্পণ করলেন। গুরু রামদাস তাকে প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। পরীক্ষান্তে গুরু শিবাজী মহারাজকে রাজ্য ফিরিয়ে গৈরিক অর্থাৎ ত্যাগের আদর্শকে অবলম্বন করে প্রজাদের দেওয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থ আর সম্পদের কেবলমাত্র রক্ষক এই জ্ঞানে প্রজার মঙ্গলে রাজ্য শাসন করবার পথ নির্দেশ দিলেন।

শিবাজী মহারজ গুরুর নির্দেশ অহরহ কীর্তন অর্থাৎ স্মরণ রেখে রাজ্য শাসন করে গেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনরূপ ঔদাসীন্য দেখাননি। এইখানেই গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে শিবাজী মহারাজের পার্থক্য। দুইজনেই গুরুর নির্দেশ পালন করেছেন। কিন্তু রাজ্য শাসনে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন প্রতাপ রুদ্রদেব। অথচ রাজ্যশাসন হতে অব্যাহতি নেননি। এ ক্ষেত্রে মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথ ভ্রান্ত নয়। ভ্রান্ত তারাই যারা গুরুর নির্দেশের অপব্যাখ্যা আর অপপ্রয়োগ করেছেন।

বিপ্লবী শ্রীচৈতন্য

সুধীর কুমার চক্রবর্তী

আজকের যুগ-মানসে চৈতন্যদেবের নতুন মূল্যায়ন রেখাঙ্কিত হচ্ছে। ঐ মানস প্রতিফলনে তিনি কেবল ধর্মপ্রচারক বা ধর্মসংস্কারক নন। তিনি তার থেকে বহুদিকের বিচারে সমাজ-বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃত। অবশ্য বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক খণ্ডের মধ্যে আবর্তিত ও ধীরজ হলেও আধুনিক পরিবর্তন-শীল সমাজের মানসিকতার আলোক সম্পাতে তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। একে উপলব্ধি করতে হলে সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি, শিক্ষাদীক্ষা, শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যবস্থা ও আর্থিক মেরুদণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন দরকার। ছোট একটি প্রবন্ধে তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি রেখা টানা যেতে পারে।

সে যুগের ভারতীয় সমাজ ছিল মূলত ধর্মীয় সমাজ। দুটি ধর্মীয় বৃত্তে তা আবর্তিত ও পরিচালিত হত। ঐ দুটি বৃত্তই ছিল পরস্পর বিপরীতমুখী। এই বৈপরীত্য ছিল পরস্পরের ধর্মীয় ভাবনায়, এষণায় আচার আচরণে, বিশ্বাসে, ধ্যানধারণায় এবং সাযুজ্য সাধনে। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও ছিল ঐ দুটি সমাজের সামনে প্রায় দুটি বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ঐ বৈপরীত্য ছিল লক্ষ্যনীয়।

সে যুগে ইসলাম ছিল রাজধর্ম। তার উদার কোল সকল নিপীড়িতের জন্যই খোলা ছিল। সেখানে ছিল ঈশ্বরের সকল বিশ্বাসী বান্দার প্রতি সমান ভ্রাতৃত্বমূলক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি। উপাসনালয়ে সকলের সমান প্রবেশাধিকার। নারী সমাজের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিশাল আহ্বান ছিল। সকলের জন্য ছিল মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষার উন্মুক্ত অঙ্গন।

পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ ছিল অবরুদ্ধ-প্রবাহ এক গড্ডালিকা। এক বিশাল বিপুল অচলায়তন। বর্ণাশ্রিত ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত শ্রম বিভাগ ছিল জাতিভাগের বিভেদাত্মক সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে আবদ্ধ। এর পাঁচটি শাখা : শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব ও গাণপত্য : পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও কসুর করত না। একের পরিবারে অন্যের কন্যার বিয়ে হত না। উপাসনা গৃহের দরজা, তা মন্দির বা পূজামণ্ডপ যাই হোক না কেন, সকল হিন্দুদের জন্য অবাধ মুক্ত ছিল না। এর সঙ্গে ছিল ছুঁৎ অচ্ছুতের দিগন্তব্যাপি ঘৃণার পরিমণ্ডল। সামন্ত শাসনে সমাজ ও গ্রাম শহরে নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি ও নানাবিধ বিপর্যয় ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। ব্যবসায়ী সমাজও খুব নির্ভাবনায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতেন না। সুলতানী সৈন্য, মনসবদার ও জমিদারদের অত্যাচার-লুণ্ঠনে তাঁরা প্রায়ই নিস্ব হয়ে যেতেন। সাধারণ ঘরে সুন্দরী মেয়ে বৌকে রক্ষা করা কঠিন হত। কঠিন পর্দাপ্রথার আবরুতেও তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা যেত না। কোন মেয়ে একবার লুণ্ঠিতা বা পরপুরুষের স্পর্শে কলুষিতা হলে, সে কোনরকমে নিজেকে উদ্ধার করে আনলেও বা নিজের কাঠিন্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করে এসে হাজির হলেও, পরিবার বা সমাজ তাকে স্থান দিত না। নব শাখে বিভক্ত বৈশ্য সমাজের তরুণরা নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বনে সংসারযাত্রা নির্বাহ করলেও ঐ সব শ্রেণীবৃত্তি সকলের সুষ্ঠু গ্রাসাচ্ছাদন ব্যবস্থা করতে প্রায়ই অপারগ হত। এ ছাড়া বিশাল সংখ্যক কৃষিজীবী ও ভূমিজ শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ ও বর্ণনাতীত। টোলের সংস্কৃত শিক্ষার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্যতিরেকে অন্য কারো জন্য এই শিক্ষার দরজা খোলা ছিল না। কায়স্থরা শিখতেন রাজভাষা ফার্সী। তাছাড়া বৃহত্তর জনসমাজ ছিল অশিক্ষার কূপমণ্ডূকতায় আবদ্ধ।

এই প্রেক্ষিতে, বিশেষত, সে আমলের গৌড়বঙ্গের হিন্দু সমাজের উপর ইসলামের আঘাত তার বিশাল ও অনৈক্যবদ্ধ সমাজদেহে ভাঙন ধরিয়েছিল। ঐ সমাজের নীচুতলায় সে ভাঙন ছিল খুব সুস্পষ্ট,

তীব্র ও প্রচণ্ড। গৌড়বিজয়ের প্রথম দিকে ইসলামের যোদ্ধারা তাদের মতে এই বিধর্মী ও মূর্তিপূজক সমাজকে, সমূলে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে "হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয় মর" নীতি নির্মম নিষ্ঠুরতায় প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তাতে অনেকাংশে সফল হলেও সর্বাংশে সফল হওয়া সম্ভব হল না। অর্থাৎ মন্দির চূর্ণ করে মসজিদ গড়া অথবা কৃষিজীবী গ্রামীণদের উপর ঐ আক্রমণ চালানো হলেও হিন্দু সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা গেল না। উপরন্তু হিন্দু সমাজ তার চারদিকে বাধানিষেধের প্রস্তর কঠিন প্রাচীর তুলে দিল। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে অনুদার ও নির্মম বহিষ্কারের নীতি নিল। প্রতিরোধ গড়ে উঠল দিকে দিকে। তাই কৌশল পাল্টান হল। এবার গাজী ও ফকীররা অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত, অচ্ছুত ও অবহেলিত মানুষগুলির মধ্যে গিয়ে ঘাঁটি গাড়লেন। ইসলামের ঔদার্য নিয়ে গিয়ে তাদের "আচণ্ডাল" নির্বিশেষে কোল দিলেন। ভ্রাতৃত্ববোধে দীক্ষিত ও নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হলেন। আর দেশের নতুন ধর্মীয় শাসকশ্রেণীর সমধর্মী হবার বাড়তি গৌরবে ও মসজিদে-উপাসনাগৃহে বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একাসনে বসবার সুযোগ পেয়ে, তারাও নতুন আনন্দ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হল। ফলে, সে আমলের গৌড়ীয় হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করতে লাগল।

সে আমলের গৌড়ীয় সমাজে ঐ ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছিল সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। দুর্মদ গতিতে চলেছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক অবধি। এই দীর্ঘ তিন-চার শ' বছর জুড়ে যে কেবল হিন্দু সমাজের নীচের তলার মানুষেরাই ইসলাম কবুল করেছিল তাই নয়, উপরতলার বহুজনও কলেমা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন নানা কার্যকারণে। কেউ শাহী ক্ষমতার অংশ লাভ ও ভোগের লোভে, কেউ অর্থনৈতিক কারণের তাগিদে, কেউ প্রেম-মুহব্বতের কারণে, কেউ রূপবহ্নির দাহতে অস্থির হয়ে, অবার কেউ বা ইসলামের ঔদার্য, সৌন্দর্য, জীবন ধারণের সারল্য ও সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে।

এই সমগ্র ধর্মীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিতে নিমাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড় হয়েছিলেন। সে আমলে প্রচলিত সর্বোচ্চ সংস্কৃত শিক্ষায় পারঙ্গম হয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারে। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে অর্জন করেছিলেন অনন্য বৈদগ্ধ। স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন সে আমলের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ও সুব্যাখ্যাকার হিসেবে। নীরস শাস্ত্র আলোচনা করেও যাঁর অন্তর ছিল রসাপ্লুত, স্নেহস্নিগ্ধ ও প্রেমময়। শাস্ত্রবৈদগ্ধ যাঁর কোন "অহংকারাপ্লুত অভিমান" সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং সে আমলের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অনুদার হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ও অত্যাচারী রূপদর্শনে তিনি একদিকে হয়েছিলেন ব্যথাতুর ও অন্যদিকে করেছিলেন বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ ছিল তাঁর একদিকে এই অনুদার ও সংকীর্ণচেতা সমাজের এবং অন্যদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত ও অত্যাচারী ধর্মীয় শাসকদের বিরুদ্ধে।

তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, সে আমলের যুগ মানসভূমিকে নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, সংঘবদ্ধ, অনুপ্রেরিত ও কর্ষিত করতে হলে ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও বিচারের উদার পরিমণ্ডল সৃষ্টি ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। আর আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে, সর্বস্বার্থ দিতে হবে বিসর্জন, চীরমাত্র ধারণ করতে হবে এবং নিজের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, জীবন-বোধ, প্রত্যয় ও কর্মের মধ্যে সাযুজ্য সাধন করতে হবে। এবং নিমাই পণ্ডিত তাই করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই উচ্চকোটির আদর্শ : আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও। যে আচরণ একদিন মুসলমান ফকীররা নিজেদের জীবনচর্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে আচরণ ভারতধর্মের সনাতন আদর্শ। যা একদিন ঘোষণা করেছিল : উচ্চ কোটির ভাবনা তোমাদের জীবনচর্যা হোক ও সামান্যভাবে জীবন ধারণ। অধুনা সাম্যবাদীদের পরিভাষায় de-classed অর্থাৎ শ্রেণীবিচ্যুত হবার সাধনায় যার রূপান্তর ঘটেছে।

এই জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে, আজকের পরিভাষায়, তিনি একটি বিপ্লবাত্মক "স্লোগান" দিয়েছিলেন :

"আচণ্ডালে দিয়ে কোল, বল হরি হরিবোল"। তদানীন্তন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার ও কূপমণ্ডূকতার দুর্গ হয়েছিল প্রকম্পিত। তাতে ফাটল ধরেছিল। কারণ যে যুগে উচ্চবর্ণেতর শ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে তাঁকে স্নানান্তে শুচিশুদ্ধ হতে হত, সেই যুগে "আচণ্ডালে কোল" দেবার উদাত্ত আহ্বান এবং তাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা, জীবন সাধনা ও তাকে সিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত করার ঘটনা তৎকালীন যুগালোকে ভীষণ ও রচনাত্মক বৈপ্লবিক। তাছাড়া, ভগবদ্ উপাসনার দ্বার ঐ "আচণ্ডালের" জন্য পরম প্রেমে ও ঔদার্যে অনর্গল করে দিয়ে আপামর সকলের জন্য "হরি নাম" বিলানোও কম দুঃসাহসের কাজ নয়। এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল আরো দুটো দুঃসাহসিক কাজ। (১) আখড়ার দৈনিক সান্ধ্য কীর্তনে "আচণ্ডাল" ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ও (২) "হরি লুটের" উদার প্রচলন। সে "লুটের" সামান্য নিবেদিত বাতাসা প্রসাদ সকলে মিলে মনের আনন্দে ও ভক্তিতে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া।

দৈনন্দীন কাজ শেষে সকলে একটা আখড়ায় মিলিত হয়ে "নাম কীর্তন" প্রবর্তনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে হিন্দু সমাজের ব্যষ্টি ভিত্তিক ধর্মাচরণের গোড়ায় জোর আঘাত পড়েছিল এবং এক্ষেত্রে সমষ্টিগত আচরণ, উপাসনা ও কীর্তনের পথ হয়েছিল প্রশস্ত, উন্নত ও দৃঢ়। অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কীর্তন ও আখড়ার সমন্বয়, ভক্তি ও প্রেমের বন্ধনে "আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে" বেঁধে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মাচরণের "আচার সর্বস্ব, জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ" দিকটিরও নিজের প্রতিষ্ঠিত পন্থায় অবসান ঘটিয়েছিলেন। 'আয়াসসাধ্য' পূজা পাঠের স্থলে কেবল নামকীর্তন করলেই ভগবানের সান্নিধ্য, কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করা যায় — এই পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেবল ভক্তিভরে নামগান ও হরিলুট। দু পয়সার বাতাসা হলেই চলে। কিছু ফুল ও তুলসীপাতা। তা তখন বাংলার হিন্দুদের ঘরে ঘরেই একটা ছোট বাগান ও একটা করে তুলসী গাছ থাকত। কারণ তখনকার গ্রামীণ সমাজ জীবনে বাগান করা ও তুলসী গাছ বোনা এবং তা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। এখনকার শহুরে সমাজের মত এমন "ন্যাড়ামোছা" ছিল না। তাই ফুল ও তুলসী কিনতে হত না। ছিল সহজলভ্য।

তেমনি বিবাহ রীতিতেও তিনি অতি সরল বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। দু'জনের মনের মিল ঘটলে কেবল "মালাচন্দনে" বিয়ে সিদ্ধ হবে। সামনে সাক্ষী থাকবে তুলসী গাছ। অর্থাৎ প্রকৃতি। স্বামী মরে গেলে প্রয়োজনে মেয়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে হবে। সৎকার হবে "সমাধি" দিয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের এইসব কার্যকলাপ দেখেশুনে ও পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, ইসলামের "সরল ও সমষ্টিগতভাবে" ধর্মাচরণের প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছিল।

এরই সাথে তিনি নবদ্বীপের শাসক কাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁর অত্যাচার ও পীড়নকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। এরজন্য শ্রীখোল ও করতাল সহকারে সহস্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ অহিংস ও প্রেমোচ্ছল অভিযানের তিনি ছিলেন পুরহিত ও পুরোধা। আজকের পরিভাষায় ঐটিই ছিল ভারতের প্রথম "সত্যাগ্রহ"।

অত্যাচারী শাসক সেই উদ্বেল জনতরঙ্গের সামনে তাঁর মদোদ্ধত শির নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম অভিমুখী শূদ্রভাঙনের প্রবাহ তার দুর্বার গতি হারিয়ে ফেলেছিল। পরন্তু তিনচারশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন শাসন ক্ষমতা ভোগের পরে ও রাজঐশ্বর্যের বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ইসলামের পতাকাবাহীদের জীবনচর্যায় আদর্শচ্যুতি ঘটিয়েছিল এবং ইসলামের আহ্বানে সেই মোহম্মদীয় ঔদার্য ও ভ্রাতৃত্বের সারাকালের হস্তাবলেপে তার কম্বুকণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছিল। তাই দেখা যায়

যে, ঐ যুগে বহু মুসলিম ঈশ্বর ভক্ত ও প্রেমিক গোঁড়া সুন্নিবাদীদের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রেম ও ভক্তি সাধনার পৃথক পন্থা গড়ে তুলেছিলেন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজে এ'রা সুফীসন্ত, আউল-বাউল ও দরবেশ বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এরই সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্লাবন বহু মুসলমান ভক্ত প্রেমিককে আকর্ষণ করে ছিল ও নিজের ধর্মীয় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত মুসলমান সমাজের প্রচণ্ড পীড়নও এ'দের বিচলিত করতে সক্ষম হয়নি। ভক্ত ও প্রেমিক যবন হরিদাসের জীবনকথা তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে।

এই ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি পেছনে রেখে শ্রীশ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদার্পণ করেছিলেন সে আমলের রাজশক্তি ও দম্ভের কেন্দ্রস্থল গৌড়-লখ্‌নৌতির উপকণ্ঠ গ্রাম রামকেলীতে। এই সমগ্র এলাকা বর্তমানে মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে ঐ পবিত্র পদার্পণ ঘটেছিল। তিনি পুরীধাম থেকে তীর্থ বৃন্দাবনের যাত্রাপথে রামকেলীতে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

সুলতান হোসেন শাহ্‌ তখন গৌড়বঙ্গের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা বিধাতা। একজন দীর্ঘ ও সমুন্নতদেহী, বলিষ্ঠ ও গৌরাঙ্গ পুরুষের ধূলি-মলিন গৈরিক চীররাচ্ছাদিত দেহকে ঘিরে এক বিশাল জনসংঘট্টের আগমন বার্তা পেয়ে সুলতানের হৃদয়ে উদ্বেগ ও চিন্তার কুঞ্চন দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর কুশাগ্রবুদ্ধি দুইজন মন্ত্রীকে খবর সংগ্রহে পাঠিয়েছিলেন। এ'রা হলেন সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব (দবীরখাস) ও অর্থমন্ত্রী (সাকর মল্লিক) রূপ এবং সনাতন।

শ্রীচৈতন্য তখন ভক্ত পরিবৃত হয়ে রামকেলীর তমাল গাছের তলায় বসে আছেন। সেখানে উপস্থিত হলেন রাজপুরুষদ্বয়। যাঁরা হিন্দু হলেও জীবনচর্যায় ছিলেন ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আর তাইতো সে আমলে স্বাভাবিক ছিল। শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে খোঁজ নিতে এসে তাঁদের অন্তরের উপলব্ধিতে কী বিপ্লব ঘটে গেল তার সাক্ষ্য বহন করছে ইতিহাস।

হঠাৎ দেখা গেল শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনধামে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে পুরীধামে ফিরে গেলেন। অনুমান রূপ সনাতনের পরামর্শেই তাঁর এই সহসা প্রত্যাবর্তন। তাঁরা হয়তো সন্দেহ প্রবণ সুলতানের দ্বারা কোন বিপদ ঘটানোর ইঙ্গিত শ্রীচৈতন্যকে দিয়েছিলেন। এর পরেই রাজক্ষমতার ও ঐশ্বর্যের মায়া ত্যাগ করে প্রথমে রূপ পালালেন। সনাতন সুলতানী মহাকরণের প্রকোষ্ঠে বন্দী হলেন। গৌড়ের "চমকান্‌" এর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। শেষে প্রহরীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়ে তিনিও পালালেন। এই উৎকোচের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন রূপ। তারপর দুভাই মোগল অত্যাচারে অবলুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে মিলিত হলেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম আন্দোলনের স্রোতে এক নতুন বেগের সঞ্চার ঘটল। রূপ ও সনাতন গোস্বামী লুপ্ত বৃন্দবনধাম পুনরুদ্ধার করলেন। শ্রীচৈতন্যের অনুভব, উপলব্ধি ও দর্শনকে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ ও প্রচার করলেন এবং নিজেরা তা জীবনে আচরণ করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন: "তৃণাদপি সুনীচেন, মৃদুনি কুসুমাদপি। বজ্রাদপি কঠোরানি, তরোরেব সহিষ্ণুনা"। অর্থাৎ তৃণের নম্রতা, কুসুমের কোমলত, বজ্রের কঠোরতা ও বৃক্ষের সহিষ্ণুতামণ্ডিত হবে একজন বৈষ্ণবের জীবন ও সমগ্র জীবনচর্যা।

এই অস্ত্র সম্বল করে শ্রীচৈতন্য সে আমলে প্রবল ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও একটা সমাজ বিপ্লব সাধন করেছিলেন। যার জন্য সনাতনী গোঁড়া মৌলববাদীরা তাঁকে রাজশক্তির সাহায্যে বাংলা ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন এবং তিনি উড়িষ্যার পুরীধামে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেইখানে বসে বাংলার রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল গৌড়-লখ্‌নৌতিতে সাংস্কৃতিক হামা দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। লুপ্ত

বৃন্দাবনধাম উদ্ধারের জন্য যার প্রয়োজনীয়তাও ছিল অসীম। সেই হানাতে তিনি গৌড়বাংলার রাজনৈতিক মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন রূপ সনাতনকে স্বীয় মতে দীক্ষা দিয়ে। বিদ্যুদ্বেগে তাঁর মত ও ধর্ম-বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ক্রমে উত্তর ভারতে বৃন্দাবনধামকে কেন্দ্র করে। ব্রাহ্মণ্য শাসিত সনাতন গোঁড়াপন্থী ভারতের নেতৃবর্গের ভ্রুকুঞ্চিত হল। এবং আমাদের অনুমান, নীলাচলের পাণ্ডারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন এবং এইটি ঘটানো সম্ভব হয়েছিল যখন তিনি ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে একাকী সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলেন। অবশ্য তাঁর ভক্তরা এই নির্মম হত্যাকে ভগবানের লীলাছলে সাগরে বিলীন হয়ে যাবার মোড়কে মুড়ে দিয়ে কি জানি কেন আড়াল করলেন। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে, চৈতন্য-হত্যার সংবাদে নতুন ধর্মান্দোলনের ক্ষতি হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মান্দোলন ও সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসের যাত্রাপথে গৌড়-রামকেলী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল স্তম্ভ। তাই ঊনবিংশ শতকের মালদহ জেলাও ঐতিহাসিক ক্রমে এই বিপ্লবের সামিল, গৌরবান্বিত অংশ।

এই সমগ্র ঐতিহাসিক পটভূমিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। ছিলেন সমাজবিপ্লবী। যাঁর সমাজ বিপ্লব ক্রমে আজকের পুনরুত্থিত হিন্দু সমাজের বিশাল ও উদার ভিত্তিভূমি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে ও গোঁড়া মৌলবাদীদের দৃঢ় মুঠি থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্ভাবনার উন্মুক্ত দ্বারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, নতুন মানব-ভাবনায় উজ্জীবিত করে।

"শ্রীগৌর চৈতন্যের অনুধ্যানে — মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মানবপ্রেম"

ডক্টর উজ্জ্বলা কুণ্ডু

জাতির কবি চণ্ডীদাস বেদনাহত হয়ে মর্মান্তিকভাবে একদিন বলেছিলেন—

শুনরে মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ বড়ো
তাহার উপরে নাই।

পাঁচশত বৎসর পূর্বের ইতিহাস আজ আমরা স্মরণ করব। বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য দেওয়াল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গণ্ডী মানুষের মধ্যে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের সমাজে পাণ্ডিত্যের সুগভীর চর্চা ছিল। বিচারে ছিল 'ব্রহ্ম একরস্য' কিন্তু ব্যবহারে সমাজ শতধা বিভক্ত। তাই একজন প্রাণের মানুষের জন্য একজন হৃদয় জুড়ান সুহৃদের জন্য গোটাজাতি যেন ছটফট করছিল। সমগ্র সমাজের ব্যথা বুকে নিয়ে প্রাণ উজাড়িয়ে শ্রীহট্টিয়া কমলাক্ষ ঠাকুর গঙ্গাজল আর তুলসীদলে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকতেন। কেঁদে কেঁদে বলতেন — 'এস প্রভো! মদনমোহন এস মরুময় সমাজে রসসঞ্চার কর'। সত্যিই তাঁর কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রাণের মানুষ নেবে এসেছিলেন আমাদেরই মধ্যে — সাধারণ জীবনের মধ্যে। এই ধূলিমলিন তাপিত তৃষিত মানুষকে দেখতে — দেখা দিতে। মানুষ পেয়েছিল একজন মানব দরদী মানুষকে। মানুষ দেখেছিল আপন অন্তর আত্মাকে — প্রেম মূর্তিমন্তরালে দেখা দিয়েছিল এই বাঙলার মাটিতে — নদীয়াপুরীতে। তিনি এসেছিলেন নদীয়ায়। কিন্তু ছিলেন সারা বাঙলার, সারা ভারতের সকল মানুষের। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পণ্ডিত মূর্খ, পুরুষ নারী, ছোট বড় এককথায় কে না সাম্য ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাঁর দেহের সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়েছে? তাই কবি মহামিলনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে গাইছেন—

'ব্রাহ্মণ চণ্ডালে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ'।

এমন প্রশ্ন ধূলিধূসরিত মাটির মানুষকে কি দিয়েছিলেন তিনি? মহাপ্রভু — কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়ে জীবের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন বলেই — তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর যিনি গৌর কথা, গৌর নাম, গৌর মাধুর্য আস্বাদন করিয়ে গৌর চৈতন্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি শ্রীগৌর-চৈতন্য নামে বাংলাদেশ সমাজে অভিহিত। এখানে শ্রীগৌরচৈতন্যের অনুধ্যানে শ্রীচৈতন্যের মানবপ্রেম দর্শন করব! নদীয়ার বিশাল বাণী একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে বলা চলে: সেটি হল প্রেম। "ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজাইলেই যেমন সৌধ হয় না, তেমনি জড়ীয় যন্ত্র পিষিয়া ভোগ্য দ্রব্যের বিপুল সম্ভার উৎপাদন করিলেই মানবীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে না। প্রত্যেকখানির ইষ্টকের সঙ্গে প্রত্যেকখানির সুদৃঢ় একত্ব স্থাপনের জন্য যেমন সিমেণ্ট বা সংযোজক মসল্লার প্রয়োজন মানব হৃদয়ের সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সেইরূপ প্রয়োজন প্রেমের। .... শিবহীন যজ্ঞ যেমন দক্ষযজ্ঞ, প্রেমহীন সভ্যতা তেমন সমরাতঙ্কগ্রস্ত উন্মাদাবাস। ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আহার্য দ্বারা উদর পূর্তির ফল, মানব প্রেম সেইরূপ ঈশ্বরীয় প্রেমের অনিবার্য পরিপূর্ণতা। কোন কৃত্রিম উপায়েই মানবীয় একত্ব আসে না। অন্তরের দেবতার সঙ্গে অন্তর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই জীবে জীবে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম জীবপ্রেম এক রেখার দুইপ্রান্ত। এই দুই প্রান্তের অখণ্ড মিলনঘন মূর্তিই মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

এই কৃষ্ণ-প্রেমের ভিত্তিতে মহাপ্রভু ছড়িয়ে ছিলেন মানবপ্রেম। বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা যায় —

শ্রীচৈতন্যের বাণীরই প্রতিধ্বনি — 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' — এই বাণীর আসল মর্মার্থ হল জীবের সেবা করতে হবে ঈশ্বরবোধে। কারণ ঈশ্বরবোধ ব্যতিরেকে জীব সেবা অহং প্রতিষ্ঠারই নামান্তর। আবার অপরদিকে লোক-কল্যাণ অর্থাৎ জীবসেবা ব্যতীত ঈশ্বর ভজন ব্যর্থ। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির ঈশ্বর ভজনের সার্থকতা লোক সংগ্রহার্থে অর্থাৎ সমাজের কল্যাণকর কর্মে আত্মদানে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অতি গভীরভাবেই অনুভব করেছিলেন যে নীচুতলার ঘুমন্ত পতিতকে উঁচুতলার গর্বিত সমাজের সাথে এক করতে ভীষণ যুদ্ধের প্রয়োজন। এই যুদ্ধে পূর্ব যুগে যে হাতিয়ার লেগেছিল তা এবারে চলবে না। এবারে নূতন যুগে নূতন অস্ত্র আনলেন — হরিনাম সংকীর্তন। মানুষকে সমাজের সাম্যভূমিতে আনতে হলে সাধন ভজনের সাম্যভূমিতে আনয়ন একান্ত প্রয়োজন। তাই মহাপ্রভু ভজন ধারায় নিয়ে এলেন সাম্য।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্রের সাধন ধনী, নির্ধন, উঁচু, নীচু সবাই মিলে একই সঙ্গে করতে পারে। দশে পাঁচে মিলে দুয়ারে বসে হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করবার নির্দেশ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত ভজনের মধ্যে এই সাম্যের সুর শোনা যায়। শুধু তাই নয় মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু লক্ষ লক্ষ জনতার পুরোধা হয়ে সত্যাগ্রহ করেছিলেন চাঁদকাজীর আইনের বিরুদ্ধে। অবশেষে চাঁদকাজীর পরাজয়। তারপর মহামিলন মামা-ভাগিনার সম্বন্ধস্থাপনে।

প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের এমন অভাবনীয় প্রেমের সামর্থ্য যে পতিতকে পতিতপাবন করে তুলে। প্রেমভক্তি দান করে সমাজের মানুষকে উন্নত করে সাম্য আনয়ন করাই হল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান কার্য। আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর দান অফুরন্ত। আমরা যদি তাঁর দুটি একটি আদেশ পালন করতাম তাহলে আমরা ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী এতবড় মহাবিদ্বেষের সম্মুখীন হতাম না। মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেত মানবজাতি। তাঁর একটি মহাবাণী — "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণে অধিষ্ঠান।" মানুষ শুধু মাত্র ধন, জন, বিদ্যাবত্তা, কিংবা আভিজাত্য অথবা উচ্চপদস্থ হিসেবে সম্মানীয় নয়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন জেনে প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দিতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপে, জীব সচ্চিদানন্দের অংশ -- 'মমৈবাংশো জীবলোকে'। এই চেতনা জাগ্রত হলে মানুষ উপলব্ধি করে সে শুধু বাঙালী নয়, আসামী নয়, আকালী নয়, নয় সে শুধু শিখ অথবা পাঞ্জাবী — সে ভারতবাসী, আরও বড় করে সে চিন্তা করতে শেখে সে এশিয়াবাসী -- আরও বড় হয় যখন, তখন ভাবে সে বিশ্ববাসী। তার অন্তরলোকে প্রতিধ্বনিত হয় — 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। সে তখন নিজেকে অমৃতের পুত্র বলে মনে করে। আজ জগৎ জুড়ে শুধু হিংসা বিদ্বেষের কোলাহলে শোনা যাচ্ছে সর্বোপরি বলছে ক্ষুদ্রতা নীচতা ও অহং প্রতিষ্ঠার রাজত্ব। তাই দেখে শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর আশার বাণী শুনিয়ে বলছেন — 'জয় নবদ্বীপ ভারত-প্রদীপ' — অর্থাৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে নদীয়ার মূর্তিমন্ত প্রেমবিগ্রহের আলোকশিখাটি জ্বাল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাভাব

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় রাধার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন :

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী-কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ, চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।।
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যাঁর কায়ব্যূহ রূপ।।

প্রেমজগতে এই মহাভাবই চরম কথা। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণ — 'শৃঙ্গাররস-রাজমূর্তিধর' এবং শ্রীরাধিকা — 'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত'। রাধা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমপুরুষ কৃষ্ণের শক্তি বা প্রকৃতি। সৎ অংশে তিনি সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তিনি কেবল কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি।

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। তাঁর মধ্যে আছে অনন্ত প্রেম, অফুরন্ত ভালবাসা ও অপর্যাপ্ত আনন্দ। এবং যদিও তিনি 'আত্মারাম' তথাপি তিনি 'লীলারাম'ও বটে। লীলা বা প্রকাশ ব্যতীত তাঁর সেই অনন্ত প্রেম ও ভালবাসা, তাঁর কাছেই অননুভূত। কাজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েও আপনার অন্তর্নিহিত প্রেম ও আনন্দের অনুভব উপলব্ধির দুর্বার তাগিদ তাঁর মধ্যেও আছে। এই প্রেমানুভূতির অনুরোধেই যিনি শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ একাই রাধা ও কৃষ্ণ, তিনি আপনার ভিতর থেকে মাধুর্যময় রাধাসত্ত্বাকে বাইরে প্রকাশ করে আপনাকে আপনি আস্বাদন করেন। —

'যদ্যপি রাধাকৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন।
তথাপি লীলার লাগি যুগপাত্বিভিন্ন।।'

আপাতদৃষ্টিতে কথাটি স্ববিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি বিরোধাভাস মাত্র। তাই চরিতামৃতকার বলেছেন :

রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।।
নিজগূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈল ত্রিভুবন।।

ভগবান কৃষ্ণের এই লীলা-আস্বাদন, সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে স্রষ্টার আত্মানন্দলাভ বা আত্মোপলব্ধিরই অনুরূপ ব্যাপার। যাকে বলা যায় —

'আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে আলিঙ্গন ॥'

শ্রীরাধার এই উদ্ভব পরিচয়ে আমরা পেলাম -- রাধা কৃষ্ণের মাধুর্যের, প্রেম ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেহেতু শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা — 'প্রেমের পরম সার', সেইজন্য তিনি কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণসর্বস্ব —

'বঁধু তোমারি গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।' রাধার শ্রী, রাধার সৌন্দর্য, মাধুর্য বা ঐশ্বর্য সবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম তাঁকে আত্মবিলুপ্তিতে অনুপ্রাণিত করেছে — আত্মবিলুপ্তির পথে আত্মোপলব্ধির দিব্য আনন্দে তিনি আত্মহারা। তাই তিনি, —

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, সুন্দরী, ভেল মাধাই।' পরম প্রেমের স্বভাবই এই আপনার সর্বস্ব-বিসর্জন --- এমন কি নিজস্ব স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্ত্বাটুকুরও। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের পরিচয়েই বলেছেন — 'ভালবাসা অর্থে নিজের যাহা কিছু ভাল, তাহাই সমর্পণ করা। অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা' — 'মনের বাগান বাড়ী'।

মহাভাবস্বরূপিণী রাধা যখন কৃষ্ণভাবে ভাবিত, কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়, তখন তাঁর অন্তর্বাহ্যজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাজ্ঞ-আত্মা বা জীবাত্মা বা পরমাত্মার সম্মেলনসূত্রে এই একই আলেখ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি —

'যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ নবাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্
এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং
কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্ ; তদ বা অস্য এতৎ আপ্ত-কামম্
আত্ম-কামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্ ॥'

প্রেমের এই অদ্বয়বোধের মধ্যে রাধার পরিচয় ঃ

"না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মম মনোভাব পেশল জানি।"

প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার

ডক্টর মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী

বৈষ্ণব কবির অমর লেখনী লিখেছে 'চিত্রম' অতীব বিচিত্রবার্তা বিস্ময়কর অথচ মনোহর। শোন সে সংবাদ।

মাত্র পঞ্চশতবর্ষ পূর্বে শ্রুতির পরাৎপর সত্যতত্ত্ব। রূপ পেয়েছিল সুবর্ণ বর্ণে, বামে এসেছিল এই ধরণীর ধূলায়। ধরা ধন্যা হয়েছিল, লীলা পুরুষোত্তমের পরম পূণ্যময় পদার্পণে, দোলের আবির আবৃত অনুরাগে রাঙা রাজপথে।

প্রকটিত হয়েছিল একটি মণিদীপের শাশ্বতী রশ্মিমালা সমগ্র মানব জাতির ব্যবহারিক ও পারমার্থক জীবন প্রণালীর ঔজ্জ্বল্য বিধান উদ্দেশ্য তাঁর সুবিশাল ব্যক্তি পুরুষের ব্যথাহরা উদাত্ত আহ্বানে সম্যক সঞ্জীবিত হয়েছিল। বেদনা-বিহত মানব সন্তানের মনপ্রাণ।

ভুলে গেছিল তারা জাতি বর্ণের ভেদ ভিন্নতা। বিদূরিত হয়েছিল উঁচু নিচুর বিরাট ব্যবধান। সমবেত হয়েছিল তার চরণ পাশে। মানব সংহতি, লাভ করেছিল এক দিব্য জীবন। ধনী, মানী, পণ্ডিত, অস্পৃশ্যে দাঁড়িয়েছিল তাঁর মহাসাম্যের পূতপতাকাতলে। এইটিই বিচিত্র বার্তা, অদ্ভুত খবর, অভুতপূর্ব সংবাদ।

সেই পরম পুরুষের শুভাগমনে নবজীবন পেয়েছিল নব্য ন্যায় চর্চায় বিশুষ্ক বিমলিন পণ্ডিত পাঠক পড়ুয়াদল। তৃষ্ণাতপ্ত মানব সংস্কৃতির মধ্যস্থলে প্রবাহিত হয়েছিল এক অভিনব রসধারা — যার মধ্যে ফল্গুর মত বহমান বৃন্দাবনীর উন্নত রসের মধুময় সুবাস আর ছিল মহাকীর্তনের উম্মাদনাময় পরম উল্লাস।

আরও বিচিত্র কথা এত বড় বৈপ্লবিক সুমহান কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য সঙ্গে অস্ত্র এনেছিলেন দুটি মাত্র। অযোধ্যাপতির ধনুকবান নহে দ্বারকাপতির গদা, চক্র নহে। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র নিজ সাঙ্গো-পাঙ্গে সর্বাঙ্গ। সেই অস্ত্র হল নাম আর প্রেম। গৌড়ীয় সাহিত্যিকদের মধুক্ষরী ভাষায় —

'গোরা করুণাসিন্ধু অবতার।
নাম প্রেমে মালা গেঁথে পরাইল সংসার।'

বক্ষে অস্ত্র নিক্ষেপ করে নয় ক্ষত আহত করে নয়, বিষয়ে বিরক্ত করে আনন্দে উম্মত্ত করে নামের বিশ্ববিহ্বকারী সূত্রে আর প্রেমের তুলসীপত্রে গ্রন্থিত মালিকা কণ্ঠে দোলায়ে। তাতে ঘটিয়েছিল ছোট বড়, ধনী মানীর অভাবনীয় একাকারতা, তাতে রাজ্য চলেছিল নগ্নপদে, কুলবধূ বেরিয়েছিল রাজপথে। নদীনালা, খালবিলের ব্যাপক একত্রীকরণ। এতবড় বিপ্লব অদৃষ্টপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ব। নাম প্রেমের পুষ্প মালিকার একটিমাত্র স্রগধরা ছন্দে।

নাম করেছিল মানবকুলকে ঊর্ধ্বমুখী। আর প্রেম এনেছিল মানুষে মানুষে একাত্মতার সংহতি। আজানুলম্বিত স্বর্ণদণ্ড ভুজযুগলের বিশাল ঔদার্যপূর্ণ আকর্ষণে তিনি বেধেছিলেন। বিচ্ছিন্ন মনুষ্যকুলকে

এক অখণ্ড একপ্রাণতায় প্রীতিরস মন্দিরে চন্দ্রাতপ ছায়ায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে তা ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

সেই কথা আজ শুধু স্মরণীয় নয়, দুর্দশাগ্রস্ত আজিকার সমাজ জীবনে সে কথা পুনরায় রূপায়ণীয়। সহস্রধাবিভক্ত, সমসাময়িক বৈষম্য, বিখণ্ডিত সুবিস্তৃত চত্বরে, আবার সংস্থাপন করতে হবে গোরাচাঁদের সেই প্রেমের বাজার। যে বাজারে বিকাবে না স্বার্থান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মতান্ধতা, বস্তুবাদের ভোগান্ধতা। থাকবে শুধু, প্রভু জগদ্বন্ধুর ভ্যায় — জয় নবদ্বীপ ভারত-প্রদীপ — সেই ভারত প্রদীপের আঁধার হরা প্রোজ্জ্বল ছটা, আর সেই ছটায় উদ্ভাসিত পুলকিত নরনারী, ঐক্যের একতানতায় শুদ্ধ, সমৃদ্ধ।

তিন গৌড়ীয় গোঁসাই

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী

॥ ক ॥

শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম,— অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবধর্ম। পূর্বের বৈষ্ণব-ধর্মের চার সাম্প্রদায়িক নাম ছিল শ্রী, ব্রহ্ম, বুদ্ধ, সনকাদি অথবা উত্তরকালের মুখ্যাচার্যগণের নামে — যথাক্রমে রামানুজ সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বকাচার্য সম্প্রদায়। কোথাও স্থান নাম বা দেশনাম ছিলনা। দেশনামে চিহ্নিত কেবল একটি — গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। গৌড় মানে বঙ্গদেশ। ঊনবিংশ শতকেও শব্দটির ব্যবহার ছিল। রামমোহন লিখেছিলেন — গৌড়ীয় ব্যাকরণ। মধুসূদনের উক্তি — "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"। বিংশ শতক ও জাতীয় বিদ্যালয় — "গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের গৌড় (গৌর?) প্রাঙ্গণও মনে হয় এই ধারারই স্মারক।

এক সময়ে গৌড়দেশের মুখ্য নগরী বা রাজধানীর নামও ছিল গৌড়। সেন আমলে ও অব্যবহিত মুসলমান আমলে গৌড় রাজধানী — যার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। শহর মালদহের উপকণ্ঠে প্রত্নদর্শন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মুখ্যধাম তিনটি — নবদ্বীপ, নীলাচল, বৃন্দাবন। নবদ্বীপে উদ্ভব ও অংকুরোদ্গম, নীলাচল পরিণতি ও বিকাশে, আর বৃন্দাবনে সংহতি ও সম্প্রচার। মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর, নীলাচলের কর্তৃত্ব থাকল না। কেবল পুণ্যতীর্থ রূপেই তার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি। নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবন এই দুইটি-ই প্রধান অনুশীলন কেন্দ্র ও সাধন পীঠে পরিণত হল। নবদ্বীপ-নগরীর কেন্দ্রিকতা শিথিল হয়েছিল নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকেই। মুখ্য ভক্তগণ গৌরবিরহে বা অন্যান্য কারণে নবদ্বীপ ছেড়ে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরেই ছিলেন। নিত্যানন্দের নূতন পীঠ হল খড়দহ। শ্রীবাসাদি ভক্তেরাও কুমারহট্ট, কাঞ্চণপল্লী প্রমুখ নানাস্থানে উঠে গেলেন। সুতরাং নবদ্বীপ নাম হলেও গৌড় বঙ্গদেশকেই বুঝাত এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় সংহতি খুব ঢিলে হয়ে গেল। তারপর অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যা-নন্দের তিরোধানের পর — শান্তিপুর, খড়দহ ছাড়া শ্রীখণ্ড, বিষ্ণুপুর, খেতুরি, গোপীবল্লভপুর প্রমুখ নানা কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবনের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে স্বয়ং মহাপ্রভুর বলিষ্ঠ পরিকল্পনা ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পরই তিনি বৃন্দাবনের দিকে পা বাড়িয়ে-ছিলেন। ভাবোন্মত্ত তাঁকে কৌশলে শান্তিপুরে নিয়ে যান নিত্যানন্দ। সেখানে মাতৃদেবী শচীঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরই ইচ্ছায় চৈতন্যের স্থিতিকেন্দ্র স্থির হয় নীলাচল। রথযাত্রা উপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রী পুরীধামে যাতায়াত করবে। অতি সহজে শচী তাঁর দুলালের খবর পাবেন। পূর্ব থেকেই লোকনাথ, ভূগর্ভ প্রভৃতিকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন পরে নিজের যখন সেখানে স্থায়ীভাবে যাওয়া সম্ভব হ'লনা, তখন তাঁর কাজগুলি ঠিক ঠিক করবার জন্য লোক নির্বাচন করলেন। সনাতন-রূপকে, গোপাল ভট্ট-রঘুনাথ ভট্টকে পাঠালেন। শেষে মহাপ্রভুর ও স্বরূপদামোদরের তিরোধানের পর এলেন রঘুনাথ দাস এবং সর্বশেষ সংযোজনে শ্রীজীব গোস্বামী। তারপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হৃদয়ানন্দ প্রভৃতিতো ছিলেন-ই। সাকুল্যে সকলেই গোস্বামী। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মুখ্যস্থানে ছিলেন ছয়জন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ।।

এই ছয়জনের মধ্যে এক গোপাল ভট্ট ছাড়া পাঁচজনেই গোড়ীয়া মানে বাঙালী। আবার তিনজন মুখ্যত্রয়ী — সনাতন - রূপ - জীব — গৌড় - নগরের অধিবাসী। শ্রীজীব অবশ্য গৌড়ে ছিলেন কিনা তা জানা নেই। তবে তাঁর পিতৃদেব বল্লভ গৌড় সরকারে দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে কর্মচারী ছিলেন। থাকতেনও গৌড়ে রামকেলিতে। কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে থাকেন তখন শ্রীজীব মায়ের কোলে শুয়ে তাঁকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু একথা প্রমাণসহ নয়। কারণ 'লঘু বৈষ্ণব তোষিণীতে' শ্রীজীব নিজের বংশ ও পিতৃগণের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এই পরম সৌভাগ্যের কোন ইঙ্গিত দেননি। যেমনটা দিয়েছিলেন জয়ানন্দ। সুতরাং সাক্ষাৎ সূত্রে শ্রীজীবকে গৌড় নাগরিক বলা যায়না বটে, তবে পিতৃসূত্রে তাঁকে গৌড়বাসী বললে অত্যুক্তি হয়না।

।। খ ।।

রূপসনাতনাদির পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্যান্ত পাওয়া যায়না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করে তাঁদের উত্তর জীবনের কথাই লিখেছেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ ও পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকগণ — একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা মনে করে রূপসনাতনের জাতীয় গুরুত্বকে খুব একটা আমল দেন নি। সুতরাং তাঁদের পূর্ণজীবনের মূল্যবান তথ্যগুলি হারিয়ে গেছে। সংসারে বিরক্ত সন্ন্যাসীরা নিজেদের পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে বা সাধন জীবন সম্বন্ধে বড় মুখ খুলতেন না। প্রসঙ্গক্রমে এক-আধটা কথা এসে পড়ত, তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞ ঐতিহাসিক শিষ্যদের দ্বারা বারবার বিজ্ঞাপিত হয়েও যোগীরাজ গম্ভীরনাথজী হেকে উত্তর করতেন — "প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা"। এটিই সংসারত্যাগী বিরক্ত সাধুসন্তের চিরকালীন মনোভাব। কাজেই রূপ-সনাতনের মুখ থেকে তাঁদের কোন কথা শোনা যায় নি। অধিকন্তু যা জানা গেছে তা বৈষ্ণবীয় বিষয়ে বিভ্রান্তিকর। রামকেলির মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনে তাঁরা বলেছিলেন—

নীচ-জাতি নীচ-সঙ্গী করি নীচ-কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে নারি লাজ ।।

ম্লেচ্ছ-জাতি ম্লেচ্ছ-সোধ, করি ম্লেচ্ছ কর্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ।। (চৈ-চ — ২/১)

জাতীয় দৈন্য প্রকাশ, বিশেষতঃ সনাতন, পরে — তা বলতে গেলে গোটা জীবনই, করেছেন। দলে সংশয় দেখা দিয়েছে যে তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা। তাঁদের পত্নীপুত্র পরিবারাদি সম্বন্ধেও যথার্থ তথ্য পাওয়া যায় না। কেবল এইটুকু আছে যে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামকেলিতে সাক্ষাতের পর শ্রীরূপ ও অনুপম গৌড় দরবার থেকে আগে বেরিয়েছিলেন এবং দেশের বাড়ী পূর্ববঙ্গে চন্দ্রদীপ বাকলা, ফতেয়াবাদ গিয়ে বিলি ব্যবস্থা করে, প্রয়োজনীয় মুদ্রা গৌড়ে সনাতনের জন্য গচ্ছিত রেখে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে একটু বিশদভাবে বলেছেন নরহরি—

পূর্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে।
কত চন্দ্রাদীপে কত ফতেহাবাদে ।।

শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া ।
বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হইয়া ।।

এদ্বারা বল্লভের স্ত্রীপুত্রের কথা হতে পারে। রূপসনাতনের পরিবার পরিজনের কথা স্পষ্ট হয় না।

এমনকি সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত বা আসল নাম কী ছিল তাও ঠিক জানা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন — অমর ও সন্তোষ। কিন্তু প্রমাণ সূত্র কী? সাকর মল্লিক ও দবীর খাস -- এই দরবারী নাম দুটিই পরিচিত। আসলে এ দুটি ব্যক্তির নাম নয় --- পদসূচক উপাধি। অনেকটা প্রধানমন্ত্রী ও একান্ত সচিবের সমার্থক। কী ভাবে তাঁরা এতো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন তাও জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন যে রূপ-সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ আগে থেকেই গৌড়ের মুসলমান রাজাদের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন এবং তাঁর সুপারিশেই এই কাজ হয়। আবার এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে। রজনীকান্ত চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন এবং এখনও গৌড় অঞ্চলের বৃদ্ধ বাসিন্দারা একটু অদল-বদল করে তা বলেন। হোসেন শাহ রাজমিস্ত্রী পীরুসাকে (ফিরোজকে) দিয়ে একটি সুন্দর মিনার তৈরী করান। সুলতান খুশি হন। কিন্তু বাহবা নেবার লোভে পীরুসা বলে যে এর চেয়েও সুন্দর মিনার বানাতে পারবে। যদি পারে তো করল না কেন পীরুসা এই বেয়াদপির জন্য সুলতান তার প্রাণদণ্ড দেন। পীরুসা প্রার্থনা করে যে মিনারটি যেন তার নামে হয়। এটি ফিরোজ মিনার। যা হোক আরো কাজ বাকি আছে দেখে সুলতান হিঙ্গা নামে এক পেয়াদাকে বলেন --- "জলদি মোরগাঁ সাধাই যা"। কেন যাবে সে কথা ক্রুদ্ধ সুলতানকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা করেনি হিঙ্গা — আর ভুল বসে সুলতানও বলেন নি। মোরগ্রাম মাধাইপুর ছিল কুমার দেবের শ্বশুরবাড়ি -- রূপসনাতনের মাতুলালয়। সেখানে তখন দু'ভাই ছিলেন। হিঙ্গাকে দেখলেন তাঁরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে। কারণ - এখানে কী করতে হবে তা জানেনা -- অথচ আসল কাজটি হদিশ না হলে গর্দান। সনাতন হিঙ্গাকে ডাকলেন এবং সব কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনে দুইভাই বিচার করে কয়েকজন ভালো রাজমিস্ত্রীকে হিঙ্গার সঙ্গে দিলেন। মোরগাঁ মাধাইপুরে নাম করা রাজমিস্ত্রী থাকত। সুলতানের খেয়াল হল যে হিঙ্গাকে তিনি কী কাজ করবে বলেন নি। অথচ হিঙ্গা ঠিক ঠিক রাজমিস্ত্রী নিয়ে এল সঙ্গে। এতো আর পেয়াদার বুদ্ধি নয়! কার বুদ্ধি? তারপর হিঙ্গার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি সনাতন ও রূপকে ডাকলেন এবং কার্যে নিয়োগ করলেন।

।। গ ।।

এগুলি কিংবদন্তী। ইতিহাস-ইস্পাতের খনিজ আকরিক উপাদান। কিংবদন্তীর বিচার ও শোধন করলেই ইতিহাস পাওয়া যায়। যা কিংবদন্তী নয়, -- লিখিত ইতিহাস সূত্রে প্রাপ্ত এবার তার আলোচনা করা যাক। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'লঘু বৈষ্ণব তোষিণী' গ্রন্থে যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশ্যই প্রামাণ্য। সর্বজ্ঞ জগৎ গুরু ছিলেন কর্ণাটের অধিপতি। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধদেবও ছিলেন মহাপণ্ডিত। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। পিতা দুই ভাইকেই রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কূটবুদ্ধি হরিহর শান্তবুদ্ধি জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে বিতাড়িত করেন। সপরিবারে রূপেশ্বর চলে আসেন পৌরস্ত্যদেশে বন্ধু রাজা শিখরেশ্বরের রাজ্যে। পদ্মনাভ নামে এক পুত্র হয় সেখানে। পদ্মনাভ বেদ-উপনিষদে পারঙ্গম। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করবার জন্য রাজা দনুজমর্দন দেবের আনুকূল্যে নবহট্টকে (নৈহাটি) বাড়ী নির্মাণ করেন। পদ্মনাভের ১৮টি কন্যা ও পাঁচপুত্র -- পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। নবহট্টকে কিঞ্চিৎ দ্রোহের জন্য কুমার পূর্ববঙ্গে চলে যান। চন্দ্রদ্বীপ বাকলায় কাজ করেন। মধ্যপথে যশোহোবাদে বর্তমান ফরিদপুরেও

একটি আবাস ছিল। কুমারের পুত্রগণের মধ্যে তিনজন বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ। এই বল্লভ ছিলেন শ্রীজীবের পিতা। শ্রীজীব কর্তৃক প্রদত্ত সাতপুরুষের বংশ লতিকার চলচ্চিত্র এই প্রকার —
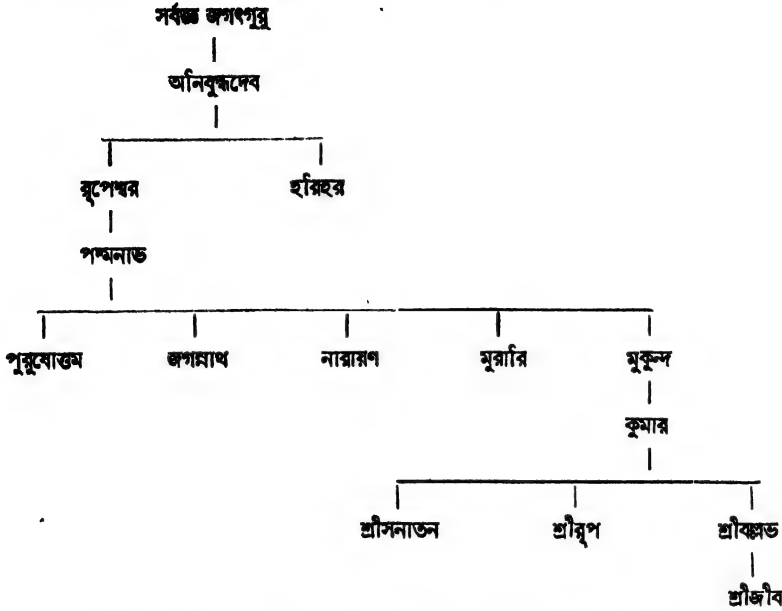
কুমারের আরো পুত্র ছিল, ('তৎপুত্রেষু') কিন্তু শ্রীজীব তাঁদের নাম করেন নি। এখানেও হয়ত বিরক্ত শ্রীজীবের প্রপঞ্চ বিমুখিতা কাজ করেছে। আচার্য সুকুমার সেন রূপ সনাতন শ্রীজীবের একটি পাতড়া পরিচয় আবিষ্কার করেছেন। তাতে আছে যে কুমারের পাঁচপুত্র বাকি দুজন সনাতনের বড় ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁরা দেশাধিপতি ছিলেন। এর সমর্থন চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। হুসেন শাহ উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রার পূর্বে বন্দী সনাতনকে এই বলে তিরস্কার করেছিলেন —

> তবে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা কহে আর বরে।
> তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥
> জীব কহ মারি সব চাকলী কৈল যাস।
> এথা তুমি মোর সর্ব কার্য কৈল্য নাশ ॥ (২/১৯)

কেউ কেউ বলেন এই বড়ভাইর নাম রঘুনন্দন।

॥ ঘ ॥

বাল্যকাল থেকেই সনাতন ও রূপ নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ নিয়েছেন বিখ্যাত আচার্যগণের কাছে। বৃহৎ বৈষ্ণব তোষিণীর মঙ্গলাচরণে কয়েকজন আচার্যের নামও করেছেন সনাতন —

ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীম্ গুরুণ।
বন্দে-বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশে বিভূষণম ।।
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ম্।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্ ।।

এর ব্যাখ্যা নিয়েও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, রামভদ্র — এই পাঁচজন শিক্ষাগুরু। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলতে বাসুদেব সার্বভৌমকে বুঝায়। তিনি নবদ্বীপে অধ্যাপনা করতেন এবং সেখান থেকে পুরীধামে যান। শ্রীসনাতন-রূপ নিশ্চয় নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন নি। বিদ্যাবাচস্পতি সার্বভৌমের ভ্রাতা ফুলিয়ার কাছে বিদ্যানগরে থাকতেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন ভট্টাচার্য ও সার্বভৌম দুটি শব্দ বিদ্যাবাচস্পতির বিশেষণ। ভক্তি রত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন —

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি।
সর্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া যাঁর ঠাঁঞি।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নহি ।।

তাঁরা দুই ভাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিভবের দিকে আকৃষ্ট হলেন কেমন করে? এই সম্বন্ধেও 'লঘু তোষিণীর' উপসংহারে লিখেছেন শ্রীজীব —

শ্রী ভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্ন দৃণ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ।।
মমন্থুঃ শ্রীভাগবতঃ প্রেমামৃত - মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোহয়ং শ্রীসনাতন নামিনাম্ ।।

ভক্তিরত্নাকরের জবানীতে —

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর অতিশয় প্রীত ।।
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেহ আনন্দ অন্তর ।।
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন আকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ।।
পাইয়া শ্রীভাগবত মহার্ঘচিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ।।
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণব তোষিণীতে প্রকাশিল ।।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গদেশে। উদীয়মান ভাগবৎ হৃদয়গুলিতে স্পন্দন তুলেছিল। কোটালী পাতা মেলে — শ্রীমধুসূদন (পরে সরস্বতী)

মহাপ্রভুর সান্নিধ্যের জনাই ছুটে আসেন নবদ্বীপে — কিন্তু তখন সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করেছেন। এই একই আবেগে সনাতন-রূপ মহাপ্রভুকে পত্র দিয়েছিলেন খুব সম্ভব ১৫১২ বা ১৫১৩ খৃস্টাব্দে এবং মহাপ্রভুও পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন কী ভাবে থাকতে হবে সংসারে। কুলটা নারী যেমন নিজের সংসারের কাজ নিপুণ হাতে করে যায় কিন্তু মন পড়ে থাকে উপপতির দিকেই। তেমনি সংসারের সব কাজের মধ্যেও সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করতে হবে।

পরব্যাসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহ কর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণর সঙ্গরসায়ণম্ ।।

পত্রে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু দেখা হল অনেক পরে। সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে ১৫১৪ খৃস্টাব্দে রামকেলিতে। বঙ্গদেশে আসার জন্য ছটফট করছিলেন চৈতন্যদেব "জাম্বী ও জাহ্নবী" দেখবার জন্য। কিন্তু রায়রামানন্দ প্রমুখের দেরী হয়ে যাচ্ছিল। শেষে সকলের অনুপস্থিতি নিয়ে ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের বিজয়া দশমীর দিনে যাত্রা করলেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। রামকেলিতে এলেন নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথম। দন্তে তৃণ করে সনাতন রূপ রাত্রে গোপনে এসে চরণ পতিত হলেন মহাপ্রভুর — দৈন্য ও আর্তি প্রকাশ করলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীরখাস।
তোমা দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ।।
আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপসনাতন।
দৈণ্য ছাড় তোমা দৈণে কাঁদে মোর মন ।।
দৈণ্যপত্র লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
নাই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যাভার ।। (২/১)

তারপর আরও নিবিড়ভাবে বললেন —

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহে মিলিবার ইহ আগমন ।।
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
যাবে বলে কেনে এলে রামকেলি গ্রামে ।। (২/১)

সনাতন ও রূপকে তাঁর চাই-ই। বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্য রচনার। পূজা-অর্চনা প্রমুখ যাবতীয় কর্মের নেতৃত্ব দিতে হবে। তারপরের কাহিনী সব চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যে আছে। রূপ ও অনুপম গৌড় থেকে বের হলেন আগে। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে সম্পত্তির ব্যবস্থা করে, সনাতনের মুক্তির জন্য গৌড়ে অর্থ রেখে — মহাপ্রভুর দর্শন আশায় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। প্রয়াগে সাক্ষাৎ হয়। দশদিন মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ভক্তিশাস্ত্র ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে যেতে বলেন। মাসেক কাল বৃন্দাবনে থেকে সনাতনের খোঁজে ফিরে চলেন দুইভাই। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। তখন একা রথযাত্রার আগে নীলাচলে যান রূপ। এখানে তাঁর রচনাদির রস ও উৎকর্ষ মহাপ্রভুর অনুমোদন লাভ করে। বারশাস্ত্র রচনার নির্দেশ পান রূপ। কয়েক মাস থেকে, গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভুর নির্দেশে তীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ স্থাপন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করতে থাকেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, বিদগ্ধসাধক, ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল

নীলমণি, পদ্যাবলী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ।

সনাতনকে বন্দী করে হোসেন শাহ উড়িষ্যা যান। কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে, নানা বিপদ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এসে সনাতন মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পান বারাণসীতে। দু'মাস কাল সনাতনকে নানা শিক্ষা দিয়ে মথুরায় লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা-বৈষ্ণবাচার প্রচার, ভক্তিশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনার নির্দেশ দেন মহাপ্রভু। মথুরা যান সনাতন। পরে নীলাচলে আসেন এবং মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করে বৃন্দাবনের দিকে যান। সেখানে মহাপ্রভুর আদিষ্ট কর্ম করেন। সনাতন রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃহৎভাগতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, দিক্‌দর্শনীটীকা, বৃহৎবৈষ্ণবতোষিণী ও লীলাস্তব প্রধান। হরিভক্তিবিলাসের গ্রন্থকর্তাকে তা নিয়ে, মতানৈক্য থাকলেও কৃষ্ণদাস ও জীবগোস্বামী সনাতনের নাম-ই করেছেন।

একমাত্র শ্রীজীব গোস্বামীই ষড়গোস্বামীর মহাপ্রভুকে দেখেন নি ও সাক্ষাৎভাবে সঙ্গ পাননি। একটি কিংবদন্তী অনুসারে রামকেলিতে সাগর কোলে জীব মহাপ্রভুকে দেখেছিলেন তা আগে বলা হয়েছে। নরহরি লিখেছেন —

শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল ॥

বল্লভ বা অনুপমের মৃত্যু হয় ১৫১৬ খৃস্টাব্দের জুন-জুলাই-এর মধ্যে। জীব তখন কতবড় ছিলেন বা মাতৃগর্ভে ছিলেন কিনা স্পষ্ট জানা নেই। জীব মেধাবী ছিলেন। একটু বড় হবার পর শ্রীপাদনিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর আদেশে বেদান্ত-ন্যায়াদি শাস্ত্র কাশীধামে পাঠ করেন এবং শেষে বৃন্দাবনে জ্যেষ্ঠতাত শ্রীসনাতন এবং রূপের কাছে যান এবং শাস্ত্রাদি প্রণয়নে সাহায্য করে, নিজে রচনা করে কনিষ্ঠ গোস্বামীটি — শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে করেন। শ্রীজীব ২৫-খানি গ্রন্থ রচনা করেন — তার মধ্যে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপালবিরুদাবলী, ভক্তিকথামৃত শেষ, মাধবমহোৎসব, গোপাল চম্পু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি।

গোস্বামীগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বৎসর নিয়ে ঘোরতর মতানৈক্য আছে — দু-পাঁচ বছর নয় অনেক বেশী যেমন, সনাতনের আবির্ভাবের পূর্বসীমা কাল ১৪৬৬ এবং উত্তরসীমা কাল ১৪৮৮ খৃস্টাব্দ। তিরোধানের এ ব্যবধান আরো বেশী ১৫৫৮ থেকে ১৫৯২। রূপের ক্ষেত্র আবির্ভাব ১৪৭০ থেকে ১৪৯৯ এবং তিরোভাব ১৫৬৮ থেকে ১৫৯২। জীবের ক্ষেত্রে ১৫১১ থেকে ১৫২৩ এবং তিরোভাব ১৫৯০ থেকে ১৬১৮। মোটামুটি ভাবে সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ থেকে ষোড়শ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ গোস্বামী শ্রীসনাতন থেকে কনিষ্ঠ গোস্বামী শ্রীজীবের মর্ত্যজীবন সীমা বিস্তৃত অনুমান করা যায়।

॥ ৬ ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে একটি সুষ্ঠুসবল শাস্ত্রসম্মত রূপ দেবার দায়িত্ব মহাপ্রভু দিয়েছিলেন — মুখ্যতঃ সনাতন ও রূপকে। তাঁদের দুজনকেই শিক্ষা বা অধুনিক ভাষায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীজীব ছিলেন পুরোপুরি জ্যেষ্ঠতাতদের পদানুসারী এবং অধিকতর উৎসাহী। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এই তিনজন গোস্বামী-ই — গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র ও অনুশাসন বলতে যা বুঝায় তার রচনা করেছেন। তাঁরা সবাই লিখেছেন সংস্কৃত-ভাষায় এক কলমও বাংলা ভাষাতে লেখেননি। দৃষ্টিতে সর্বভারতীয়। সংস্কৃতই বিদগ্ধ ভারতের রাষ্ট্রভাষা। ব্যক্তিগত চরিত্রের, তারতম্যও লক্ষণীয় সনাতনের দৈন্য, বিনয়, সহিষ্ণুতা,

ভেদ — রূপের ক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত কম, শ্রীজীবের আরো কম। চরিত্রে তাঁরা মুখ্য অভিপ্রায়িতার দিক দিয়ে যথাক্রমে ধ্যানী, কবি, ফণী। এবং তাদের জীবনের প্রস্তুতি পর্ব প্রথম জীবন-ও সুবিশাল। কিন্তু এর পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। এ সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করা ও গবেষণা করা প্রয়োজন। খুবই কঠিন কাজ। প্রথম অসম্ভব কাজ, তবু করণীয়। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক মানবিকতার দিক থেকে নয় — সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই — অন্ততঃ তিনটি সত্ত্বা বা ব্যক্তিত্ব থাকে — বলতে পারা যায় — বাস্তবসত্ত্বা, ভাবসত্ত্বা ও ধ্যানসত্ত্বা। অনেকটা স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহের মতো। বাস্তব সত্ত্বা দিয়ে বস্তু জগতের, স্থূল জগতের পরিচয় পাওয়া যায় — এবং সেটি সাধারণ। কে হিন্দী বলে সামান্য, এবং যথার্থ ভাবেই বলে। মানে common, normal — এটাকেই সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক বলে। ভাবদৃষ্টিতে বিশেষ একটি ভাব দ্বারা সেও আবরণ থাকে — বস্তু আবাল্য ভাবটি প্রাধান্য পায়। আরাধ্য দৃষ্টিতে বস্তুর স্থূলসত্ত্বার বিলুপ্তি ঘটে। নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণবগণ সর্বদাই ভাবদৃষ্টি দিয়ে দেখেন — ধ্যানের পথের যাত্রী তাঁরা। সুতরাং সাধারণ ইতিহাসকে খুঁজতে গেলে তার পথ আলাদা, পথকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠায় এ দিনের দায়িত্ব নিতে পারেন। ব্যক্তি উদ্যমে পাঁচশত বছরের উজানে যাওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সন্ধানরীতির প্রয়োগ করলে — এবং অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলে, পাঁচশত বছরের মানে একশটি প্রজন্মের যার, পুরানো বিষয় — কিছু না কিছু জানা যায়। তবে সর্বাত্মক নিবারণ প্রচেষ্টা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের, সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির একাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

রূপ-সনাতন-শ্রীজীবের পূর্বজীবন উদ্ধারের কথা আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে — রামকেলি উৎসব — উৎসবের উদ্ভব, বিস্তার, প্রকরণ ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। রূপসাগর সনাতনসাগর তৈরী হয়েছিল কখন? বলা হয় যে রামকেলি নামটি এসেছিল বলবাস থেকে। বাণযুদ্ধের সময় বলবাসের শিবির ছিল এই গ্রামে। রাম ও বাসনার প্রাধান্য থেকে রামকেলি নাম হতে পারে না? অনুপম বাস উপাসক ছিলেন। তাঁর কোন ভূমিকা নেই এখানে?

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটি বিরোধের সমাধান না করতে চেষ্টা না করা। পারা সম্ভব কিনা সেকথা স্বতন্ত্র। রামকেলির উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই সংক্রান্তিতেই মহাপ্রভু রামকেলিতে এসেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি মানে জুন মাসের মাঝামাঝি। কিন্তু মহাপ্রভুর বিভিন্ন জীবনী লেখকদের হিসাবানুযায়ী — তিনি রামকেলিতে এসেছিলেন নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। হিসাবটা এই রকম। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন স্নানযাত্রার আগে ১৪৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে +- অর্থাৎ ১৫১২ খৃস্টাব্দের জুন-জুলাই। বঙ্গদেশে পর্যটন ইচ্ছা থাকলেও রায়রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রমুখ পুরীর ভক্তগণের আগ্রহে বছর দুই যেতে পারেন না। অবশেষে ১৪৩৬ সালের বিজয়া দশমীতে, অর্থাৎ ১৫১৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে গৌড় যাত্রা করেন। নবদ্বীপ শান্তিপুরাদি হয়ে রামকেলিতে আসতে দেড় মাসের বেশি হওয়ার কথা নয়। তার মানে ১৫১৪ খৃস্টাব্দে নভেম্বর-ডিসেম্বরে রামকেলি আসেন। কিংবদন্তীর উল্লেখ সময় — আর ভ্রমণসূচীর বিবাদ এদের মধ্যে পার্থক্য — প্রথম ৬ মাসের। গবেষক বিশেষজ্ঞ ডাঃ নরেশ জানা — চৈতন্যচরিতামৃতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্বারা কিংবদন্তী সমর্থন করেছেন। রামকেলি থেকে পুরীধামে ফিরে এসে মহাপ্রভু একা বৃন্দাবন যাত্রা করতে চেষ্টা করেন। ভক্তরা বাধা দেন। গদাধর পণ্ডিত বলেন—

এই আগে আইস প্রভু বর্ষা চারিমাস।
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ (চৈ - চ — ২'১৬)

আগে বর্ষা চারমাস, মাঝে অব্যবহিত চারমাস। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন — রামকেলি থেকে ফিরে আসবার পরই ধুমে বর্ষা। যদি চারতকারদের হিসাব ঠিক হয়, নভেম্বর - ডিসেম্বর হয়, তবে তার চারমাসে — সামনে বাধা আসেনা। ৬ মাস ব্যবধানে আসে। কাজেই কিংবদন্তীর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির ব্যাপারটি এ দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু যুক্তিটিরও — যুক্তিপ্রমাণসূত্র সবল নয়। অথচ প্রচলিত হিসাব মেনে চিরায়ত ঐতিহ্য সাধিত কিংবদন্তীর মূল্য কম নয় — এ দিকটিও গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি আলোচনা-যোগ্য। রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণের তারিখটি সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

॥ চ ॥

সনাতন-রূপ-শ্রীজীব -- গোস্বামীত্রয়ের পূর্বজীবন ও রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণের যথার্থ সময়টির ঐতিহাসিক দিন থেকে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। এটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে হ'তে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করতে পারেন। উদ্যম ও উদ্যোগ যথার্থ ও একনিষ্ঠ হলে অর্থাভাব হয়না কোনদিন। কাজেই অর্থ নয়, উদ্যোগী মানুষ চাই। গৌড়ের নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্যে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা এখনও অপেক্ষিত।

পাদটীকা

(ক) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭৩ খৃস্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর থেকে তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১০ জন গবেষক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের একটি দল ১০ দিনের জন্য গৌড় সমীক্ষা এবং রামকেলি - রূপসনাতন সম্বন্ধে তথ্য গ্রহণের জন্য কাজ করেছিল। মহদীপুর হাই স্কুল ছিল মূল কেন্দ্র। কিন্তু ১৪ই ডিসেম্বর মাধাইপুর যাবার পথে একটি ডাঙ্গা দুর্ঘটনায় ডঃ চক্রবর্তী ও স্থানীয় পথপ্রদর্শক গুরুতরভাবে আহত হন। ফলে ৮ দিনের মাথায়-ই সমীক্ষা কর্ম স্থগিত হয়। তারপর আর কর্তৃপক্ষ সমীক্ষাটি শেষ করবার অনুমতি দেন নি। বিবরণীও অসমাপ্ত হয়ে আছে। যা হোক এই পর্যন্ত কথা বা কিংবদন্তী সেই সমীক্ষাতে পাওয়া গিয়েছিল।

—

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

"শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বটি কামতত্ত্ব। কামবীজ ও কামগায়ত্রী ইহার স্বরূপ ...... রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্বের দুইটি দিক। উভয়ে ভেদ নাই এবং আত্যন্তিক অভেদ ও বলা যায় না। এই জন্যই এইটিকে যুগল তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এক এবং বহু, ইহার মধ্যবর্তী অবস্থা ও দুই। দুইকে আশ্রয় না করিয়া এক বহুরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। বহু অবস্থায় ভেদ পরিস্ফুট থাকে। কিন্তু যখন এই পরিস্ফুট ভেদ অতিক্রান্ত হয়, তখন অভেদের মধ্যেই যাবতীয় ভেদ উপসংহৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থাটি যুগল অবস্থা। একই তত্ত্ব অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে অবশ্য একই বলা হয়। তথাপি তাহা এক হইয়াও দুই। প্রকারান্তরে তাহা ঠিক দুই ও নহে। তাহা দুই হইয়াও এক। যেখানে শুধু এক সত্ত্বা, যেখানে দ্বিতীয়ের আভাস একের মধ্যে জাগরূক থাকে না, সেখানে এক নিজেকে ও নিজে দেখিতে পায় না। ইহা বোধহীন জড়ত্বের অবস্থা। এই এক সত্ত্বা প্রকাশাত্মক চিদ্স্বরূপ হইলেও ইহাকে চেতন বলা যায় না। কারণ ইহা নিজের স্বরূপ নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে উপলব্ধি নাই, সেখানে আনন্দের আস্বাদন কোথায়? এইজনাই মহাচৈতন্যে এক কলা সুপ্তির আবির্ভাব হইলে পরিচ্ছন্নতাবশতঃ অবিভক্ত এক সত্ত্বা দুই সত্ত্বায় পরিণত হয়। অর্থাৎ একসত্ত্বার মধ্যেই দ্বিতীয় সত্ত্বার স্ফূরণ হইয়া থাকে। এই অবস্থায়ই আনন্দের আস্বাদন সম্ভবপর।"

রাধা-কৃষ্ণের জ্যোতিষ-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা

ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে মূলত কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল না, ইহা মূলত ঃ একটি জ্যোতিষতত্ত্ব। বিষ্ণু হইলেন সূর্য; বেদে সূর্য অর্থে 'বিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। এই সূর্যরূপ বিষ্ণুই প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই ত্রিপাদে পরিক্রমণ করেন। ইহা হইতেই ত্রিপাৎ বামন অবতার এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকে তাঁহার তিন পাদক্ষেপের কল্পনা উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণ হইলেন এই বিষ্ণুর অবতার, অর্থাৎ সূর্যের রশ্মিস্থানীয়, বা প্রতিবিম্ব। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪০) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাণাদিতে গর্গমুনির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বেশ বোঝা যায়, আসলে তিনি ছিলেন একজন জ্যোতিষে বিশেষজ্ঞ, এই জন্যই আদিত্য-অবতার কৃষ্ণকে তিনি প্রথমে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন; তিনিই কৃষ্ণের নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ হইল সূর্য-প্রতিবিম্ব, গোপীতারকা। ব্রজে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু অলৌকিক লীলা সকলই হইল সূর্যপ্রতিবিম্ব এবং তারকাগণকে লইয়া। কৃষ্ণের রাসলীলাকে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা দিয়া যোগেশবাবু বলিয়াছেন, —"রাধানাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে বিশাখা, অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা। অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথর্ব বেদে 'রাধো বিশাখে' এই স্পষ্ট উক্তি আছে। বিশাখা নাম হইবার হেতু এই। এই নক্ষত্রে শারদ বিষুব হইত, বৎসর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইত। ইহা খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কথা। বোধহয় ইহার পূর্বে নক্ষত্রের নাম রাধা ছিল। রাধা অর্থে সিদ্ধি। এই নাম কেন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আরও অনেক নক্ষত্র-নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্র হইয়া গিয়াছে। মহাভারতে কর্ণের ধাত্রী মাতার নাম রাধা, এবং কর্ণ রাধেয় নামে সম্বোধিত হইতেন।"

'কার্তিকী পূর্ণিমার সূর্য বিশাখার দিকে, বিশাখায় থাকে, রাধার সহিত সূর্যের মিলন হয়, কিন্তু অদৃশ্য। একদা তারা ও সূর্য দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। প্রাচীনেরা মনে করিতেন সূর্যের রশ্মিতেই তারার তারাত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রিকা। গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী তারা। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন। চন্দ্র পুংলিঙ্গ না হইলে তিনি এই নামেই রাধার প্রতি-নায়িকা হইতে পারিতেন। কারণ পূর্ণিমাতে চন্দ্র রবির বিপরীত দিকে থাকে। প্রতি-নায়িকার নিমিত্ত ইদানীং বঙ্গীয় কবিকে চন্দ্রাবলী নাম নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্র-সূর্যের মিলন হয়, কৃষ্ণ গোপনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন।' যোগেশবাবু এ সম্বন্ধে আরও দেখাইয়াছেন, রাধা বৃষভানুর (অপভ্রংশে বৃথভানু, বৃক-ভানু) কন্যা। বৃষভানু হইল বৃষরাশিস্থ ভানু, রশ্মি। কৃত্তিকা বৃষরাশিতে অবস্থিত। রাধার জননীর নাম কৃত্তিকা হইবার কথা, পদ্মপুরাণে নামটি আছে 'কীর্তিদা'। রাধার স্বামীর নাম আয়ন (পরে আয়ান) ঘোষ। 'অয়নে ভব আয়নঃ'; অয়নে, উত্তরায়ণ দিনে জন্মহেতু আয়ন। তখন উত্তরায়ণ ফলশূন্য নপুংসক হইল। এই সকল নানা ভাবে বিচার করিয়া যোগেশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কতকগুলি জ্যোতিষতত্ত্বই কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রূপকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা পৌরাণিক যুগের এই জ্যোতিষতত্ত্বটি আস্তে আস্তে ভুলিয়া গিয়া রূপকটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই রূপকাশ্রয়ে বহু পল্লবিত রাধাকৃষ্ণ লীলাপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে। যোগেশবাবুর বিচারে আমরা পুরাণাদিতে যে ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ পাই তাঁহার কাল হইল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক এবং রাধার কাল হইল খ্রীস্টাব্দ তৃতীয় শতক।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় যোগেশবাবুর মত প্রণিধানযোগ্য বটে বৈদিকযুগের বিষ্ণুর সূর্যের সহিত সম্পর্ক অনস্বীকার্য। পরবর্তী কালে দেখিতে পাই, রাধার সখীগণের মধ্যে 'বিশাখা' একজন প্রধান। তাহাছাড়া সখীগণের ভিতরে 'অনুরাধা' (ললিতা), জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ভদ্রা প্রভৃতির নাম পাইতেছি। ব্রজদেবী-গণের মধ্যে একজনের নাম তারকা (ভবিষ্যতের ও স্কান্দসংহিতা মতে, জীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত)। চন্দ্রাবলীর (চন্দ্র ?) অন্য নাম পাইতেছি সোমাভা ; চন্দ্রের সহিত সোমাভা নামের সম্বন্ধও লক্ষ্যণীয়। এই রাধা এবং সখীগণ ছাড়াও দেখিতে পাই, কৃষ্ণের পরিবারের কয়েকজন স্ত্রীও কয়েকটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেমন বসুদেব-পত্নী রোহিণী, বলদেব-পত্নী রেবতী, কৃষ্ণ-ভগিনী চিত্রা (সুভদ্রা) প্রভৃতি। এই সকল দৃষ্টে মনে হয়, পৌরাণিক যুগে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার মূলেও উপরি উক্ত বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক প্রভাব থাকা সম্ভব ; কিন্তু এ-বিষয়ে আরও অনেক স্পষ্ট তথ্য না পাইলে গোপীগণ ও রাধাকে লইয়া কৃষ্ণপ্রেমের যে সমৃদ্ধ উপাখ্যানাবলী তাহা সবই যতগুলি জ্যোতিষতত্ত্বের রূপকাশ্রয়ী রূপমাত্র এ-কথা এখন সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া শক্ত। তবে শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটকাদি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, রাধার যে এই একটা তারকারূপ রহিয়াছে তাহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহার কবিজনোচিত সালংকৃত বর্ণনার ভিতরে ইহার বহু সন্ধান মেলে ললিতমাধবে (১ম অঙ্ক) দেখিতে পাই, রাধার অপর নাম তারা, — তারা নাম লোওত্তরা কণ্ণআ'। অন্যত্রও রাধাকে লইয়া একটি চমৎকার শ্লেষ দেখিতে পাই —

দনুজদমনবক্ষঃপুষ্করে চারুতারা
জয়তি জগদপূর্বা কাপি রাধাভিধানা।

"দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-রূপ আকাশে যে রাধা নামে একটি জগদপূর্বা চারুতারা — তাহারই জয়।" বিদগ্ধমাধব নাটকে সূত্রধার-শ্লোকে দেখিতে পাই —

সোহয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ় নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥

এখানে দেখিতেছি বৈশাখ-পূর্ণিমায় রাধা বা বিশাখা নক্ষত্রের সহিত পূর্ণিমার আবির্ভাব ; পক্ষান্তরে কৃষ্ণমিলনের জন্য দেবী পৌর্ণমাসীর সহিত রাধিকার আবির্ভাব। এরূপ দৃষ্টান্ত রূপ গোস্বামীর রচনায় আরও অনেক আছে। ইহা ব্যতীত এই সকল নাটকাদিতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, রাধা বহুস্থানেই সূর্যোপাসিকা। শ্রদ্ধেয় বিদ্যানিধি মহাশয় 'চন্দ্রাবলী' সম্বন্ধে উপরে যে কথা বলিয়াছেন তাহার সহিত রূপগোস্বামীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

পদ্মা। হলা সচ্চং ভণাসি। তথাহি —
বিজ্জোদন্তী রাহা পেক্খিজ্জই তাব তারআলীহিং।
গঅণে তমালসামে ণ জাব চন্দাঅলী প্ফুরই ॥

ললিতা। (বিহস্য সংস্কৃতেন)
সহচরি বৃষভানুজায়াঃ প্রাদুর্ভাবে বরাত্বিষোপগতে।
চন্দ্রাবলীশতান্যপি ভবন্তি নির্ধূতকান্তীনি ॥

দেবতারে প্রিয় করি

ডক্টর সুকুমার সেন

সব দেশে সব কালে যখনই মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা ঈশ্বরের ধারণায় পৌঁচেছে তখন সর্বত্র সে ঈশ্বর-বোধ রাজার অথবা গোষ্ঠীপতি পিতার আদর্শ অনুকরণ করেছে। ঈশ্বর রাজার মতো যা খুশি করতে পারেন, দণ্ডবিধান করতে অথবা পুরস্কার দিতে তাঁকে কোন আইন মানতে হয় না, কারো মুখ চাইতে হয় না। শিশু যেমন খেলার পুতুল নিয়ে ভাঙতে গড়তে যা খুশি করতে পারে ঈশ্বরও তেমনি তাঁর সৃষ্ট জীব ও অজীব নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাঁকে যদি পিতা কল্পনা করি তবে সেই পিতা যিনি বাড়ীর সর্বময় কর্তা যাঁর কথার প্রতিবাদ চলে না, যাঁর হুকুমের অন্যথা নেই। এমন ঈশ্বরকে রাজাই ভাবি আর বাবাই ভাবি 'পার্সোনাল গড্' ভাবতে পারি না, কেননা রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্কে মনের কারবার নেই, আছে ভয়ের বন্ধন, সুবিধা-অসুবিধার সংযোগ। যেমন কড়া বাপের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক এড়িয়ে চলার।

আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে সম্বন্ধ তা সর্বদা এবং গোড়া থেকেই পার্সোনাল। বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু দেবতার সম্বন্ধে যে ভাবনা আমরা করে এসেছি তাতে হৃদয়াংশের যোগ কম বেশি আছেই। বেদের মুখ্য দেবতারা প্রায় সবাই দয়ালু, তাঁরা খুশি হলে ভালো করেন, পিতার মত উপহার দেন, অখুশি হলে অনেক রকম ক্ষতি হয়। তাই উপাসকের সর্ববিধ চেষ্টা যাতে দেবতা খুশি থাকেন, তাঁর কিছুতে যেন রোষ না জাগে।

ঋগ্‌বেদের দেবতা সমাজে বিষ্ণুর আসন সবার আগে নয়, বরং অনেকেরই পরে, যদিও তাঁর কীর্তি সকলের চেয়ে মহীয়ান্। বয়সে তিনি সবার ছোট, ইন্দ্রের অনুজ তিনি। কিন্তু তিনিই আকাশকে উপরে তুলে দিয়ে পৃথিবীকে মেলে দিয়েছেন, মাঝখানে প্রচুর ফাঁক ('অন্তরীক্ষ') রেখে বিশ্বভুবন নির্মাণ করেছেন। সুতরাং সবাই তাঁরই আশ্রিত। বিষ্ণুর রোষ নেই, দর্প নেই। তিনি আনন্দের ভাণ্ডারী। তাঁর যেখানে বাস সে হল ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বতমলোক। সেখানে ভোজের প্রাচুর্য। মধুর উৎসব সর্বদা উচ্ছলিত।

বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে দেবতা বিষ্ণুকে দেখি তিনি সংসারের শিশু এবং সেই সঙ্গে দেবতাদের দেবতা। তিনি এখন ঘরের ছেলে — 'শিশুর্দন' তিনি হয়েছেন যজ্ঞস্বরূপ, তিনি হয়েছেন গৃহদেবতা, যজ্ঞের অগ্নি। হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশে ব্রাহ্মণের একটি বিশিষ্ট কাহিনী এখানে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করছি। গল্পটির উল্লেখ আমি একাধিকবার অন্যত্র করেছি। তবুও অনেকের জানা নেই আশঙ্কা করে আবার বলছি।

অসুররা দেবতাদের বড় ভাই তবে বৈমাত্র। অসুররা বড় জ্ঞানে, দেবতারা বড় শিল্পে। পৈতৃক সম্পত্তি পৃথিবীর ভার অসুররাই বহন করে, দেবতারা সংসারের দায় থেকে রেহাই পেয়ে আমোদ করে। দেবতাদের অকর্মন্যতায় অসুররা তাদের অবজ্ঞা করতে লাগল। এই অবজ্ঞা থেকে জন্মাল দম্ভ। অসুররা ভাবল, এ পৃথিবীর মালিক তো আমরাই। তখন তারা বলাবলি করলে, এস আমরা এই পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিই। যে কথা সেই কাজ। বণ্টনকার্য প্রায় শেষ হয়ে এল এমন সময় দেবতারা টের পেলেন যে অসুররা তাদের বঞ্চিত করে পৈতৃক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে। তাঁরা শিশু বিষ্ণুকে নিয়ে তখন ছুটল অসুরদের কাছে। অসুররা বললে, তোমাদের দেবতার মতো তো আর

কিছু বাকি নেই। আমরা সব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছি। দেবতারা মুশকিলে পড়লেন। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা বললেন, একটু স্থান তো আমাদের দিতেই হবে। অন্ততপক্ষে এই শিশু বিষ্ণুর শোবার মতো ঠাঁই। অসুররা অনুকম্পা করলে, বললে, বেশ বিষ্ণুকে শুইয়ে দাও। ওর হাত পা মেলে শুতে যতটা ঠাঁই ততটুকু ঠাঁই নিতে পার। সেইখানেই শুয়ে পড়লেন বিষ্ণু হাত পা মেলে আর তাঁর শরীর তরতর করে বেড়ে চলল চারদিকে। হটতে হটতে অসুররা পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল। কোথায় গেল তার উল্লেখ নেই। বোধকরি পাতালে। এই কাহিনী ভেঙেই পুরাণের বামন-অবতার ও বলি-ছলনা গল্প গড়া হয়েছে। দেবতারা সর্বাধিকার পেলেন। বিষ্ণু তখনই 'সর্বদেবময়ো সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ' হয়েছেন, — যজ্ঞ তথা যজ্ঞীয় অগ্নি তাঁর প্রতীক অথবা তিনি সত্রর ও যজ্ঞীয় অগ্নির দেবরূপ।

হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর আদি উপাসনা যজ্ঞেশ্বর হিসাবে, তাঁর অধিষ্ঠান সবিতৃমণ্ডলের মধ্যস্থলে। এ উপাসনার যে ভক্তিভাব সে শান্তভক্তির। সে ভক্তিতে ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে 'পার্সোনাল রিলেশান' অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির কোন অবকাশ নেই।

বেদের গণ্ডী পেরিয়ে এসে আমরা ঋগ্‌বেদের 'গোপা' (অর্থাৎ রক্ষিতা ও ভর্তা) বিষ্ণুর মতো নূতন (?) এক দেবতা পাই বাসুদেব। ইনি প্রায় পরিপূর্ণ মানবকল্পনার অনুযায়ী দাতা ও ভর্তা বীর। এই বীর দেবতা একা অথবা পাঁচজনের মধ্যে (পঞ্চবীরাঃ) দুইভাবেই উপাসিত হতেন। মহাভারত-হরিবংশের কাহিনীর মুখ্য যাদব বীরদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এ'দের সঙ্গে। বাসুদেব-উপাসনার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে পাণিনির সূত্রে (সেই সূত্রে যে অর্জুনের উল্লেখ আছে তিনি বলদেব বা বলরাম, তৃতীয় পাণ্ডব নন)। পণ্ডিতেরা বাসুদেব ও পঞ্চবীর উপাসনা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। সে কথার পুনরাবৃত্তি এ প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। আমার বিশেষ বক্তব্য হল তিনটি। এক, বাসুদেব ভাবনার সঙ্গে ঋগ্‌বেদের বিষ্ণু-ভাবনার যোগ দুর্লক্ষ্য হলেও আছে। বৈদিক দেবসমাজে বিষ্ণু যদি অর্বাক বৈদিক ফিউডাল গোষ্ঠীর দেবতায় পরিণত হন তবে তিনি হবেন দাতা ধাতা রক্ষিতা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ 'পার্সোনাল গড'। দুই, 'বাসুদেব' অভিধাটি তদ্ধিতান্ত অপত্য শব্দ নয়, সমাসবদ্ধ মৌলিক শব্দ অর্থাৎ শব্দটি 'বাসুদেব' থেকে আসেনি, সোজাসুজি 'বাসু-দেব'। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় শব্দটি দুরূপেই ছিল— দীর্ঘ স্বরযুক্ত Wesu (যার সংস্কৃত প্রত্যাশিত রূপ 'বাসু') এবং হ্রস্ব স্বরযুক্ত Wesu (সংস্কৃতে 'বসু')। মানে একই। 'বাসু' শব্দটি সংস্কৃতে একেবারে অজ্ঞাত নয়। তার উদাহরণ, বাসুদেব ছাড়া জৈন শাস্ত্রে 'বাসুপূজ্য'। বাংলায় চামুণ্ডার নামান্তর 'বাশুলী'। বাসলী এই শব্দ থেকে উৎপন্ন বলে মনে করি। অর্থ মঙ্গলকারিনী দেবী ভদ্রকালী। বাসুদেব উপাসনায় ভক্ত ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ সে হল সেনাপতি-সৈনিকের এবং প্রভু-দাসের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে দুই তরফের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগ আছে। সে যোগ হল দাস্যভক্তির, সে যোগ কৃতদাসের বাধ্যবাধকতার নয় — কৃতজ্ঞতার, অনুরক্তি।

বেদের বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ হয়েছেন বাসুদেবকে সোপান করে নয়। বরং কৃষ্ণই যোগ করেছেন বিষ্ণু এবং বাসুদেবকে এবং দু ভাবনকেই আত্মসাৎ করেছেন। বিষ্ণু শিশু দেবতা, পোঢ় দেবতা ইন্দ্রের নেহাত ছোটভাই — সম্ভবত সহোদর নয়। বিষ্ণুর মতো দেবতার অন্তঃপুরে কনিষ্ঠা ছিলেন ধরে নিতে পারি। তাহলে তিনি ছিলেন দেবিকা বা দেবকী। এইখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একটা মিল পাচ্ছি। (যাঁরা ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত ঘোর আদিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব মানেন তাঁদের সঙ্গে আমি এখানে বিবাদ করছি।) ওদিকে বাসুদেব নামটিকে ভেঙে পাওয়া গেল পিতৃনাম বসুদেব (অর্থাৎ বসুদেবতাদের একজন)।

এখন প্রশ্ন জাগে 'কৃষ্ণ' নামটি এল কোথা থেকে। ঋগবেদে কোথাও বিষ্ণুর পায়ের রঙের কোন

উল্লেখ নেই। বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণনামে অথবা বিশেষণে বিশেষিত একাধিক দাস-দস্যু অথবা দানব-অসুরের উল্লেখ আছে। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই যদি কোন দাস দস্যুর বিশেষ মিল এর সঙ্গে জড়িয়ে না থাকে। উপনিষদের বংশ তালিকায় উল্লিখিত দেবকী পুত্রের ঐতিহাসিকত্ব আমি এই আলোচনায় আনছি না। অগত্যা আমি কল্পনা করছি যে 'কৃষ্ণ' এসেছে কৃষ্ণ-মেঘের উৎপ্রেক্ষণ থেকে। কালিদাসের একটি উক্তি আমাকে এই কল্পনায় উসকানি দিয়েছে।

রাবনাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুৎ-শস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে ।।

'রাবন অনাবৃষ্টিক্লান্ত দেব শস্যকে এই বাক্‌বর্ষণে অভিষিক্ত করে কৃষ্ণমেঘ তিনি তিরোধান করলেন।' ইন্দ্র বজ্র-বিদ্যুতের দেবতা। জলভরা মেঘ তাঁর বাহন। বৈদিক দেবতা কল্পনায় বাহন নেই রথটানা ঘোড়াছাড়া। বাহনের পরিবর্তে আছে সহকারী। ইন্দ্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন বিষ্ণু, বিশেষ করে বৃত্রবধকার্যে। সুতরাং জলভরা মেঘকে ইন্দ্রের বাহন কল্পনা করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত 'ইন্দ্রনীল' শব্দটি এখানে স্মরণ করি। কৃষ্ণের রঙ ও ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রের পায়ের রঙের কোথাও উল্লেখ নেই। নীল তার রঙ হতে পারে, কালো মেঘের রঙও বোঝাতে পারে।

বৈষ্ণব ধর্মের ঈশ্বর-উপাসনার ক্রম নির্দিষ্ট আছে পাঁচটি — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত ভক্তির উপাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের (বা সাধকের) কোন পার্সোনাল রিলেশন নেই, সে কথা আগে বলেছি। বাকি চারটির সঙ্গে আছে। দাস্যভক্তির কথাও বলেছি। সখ্যভক্তির সাধনার কোন বিবরণ কোথাও দেওয়া নেই। এ ভক্তির উদাহরণ গীতায় কৃষ্ণ ও অর্জুনের ব্যবহারে, ভাগবতপুরাণে সুদামার উপাখ্যানে, বাংলায় কৃষ্ণ-মঙ্গলে ও পদাবলীতে গোপবালকের প্রসঙ্গে খুঁজতে হয়। কোন কোন জন্মসিদ্ধ বালক মহাপুরুষ অথবা মূর্খ ভক্তের জীবন-কাহিনীতেও মিলে। সম্পূর্ণ সমান চক্ষে ও সমভূমিতে দেখলে সখ্যরসে ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সুতরাং সখ্যভক্তি একদিকে শান্ত অপরদিকে মধুর ভক্তির মধ্যেই পড়ে। সখ্যরস নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সখ্যভক্তি বলে কিছু নেই। ভক্তির যোগ থেকে সখ্যের সমভূমি থাকেনা, ভক্ত সখা হয়ে পড়ে অন্তরঙ্গ দাসের মতো।

বিষ্ণু-কৃষ্ণের উপাসনায় বাৎসল্য ও মধুর রসের বীজ প্রাচীন ঐতিহ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শিশু বিষ্ণু দেবতা সংসারে বাৎসল্যরস জাগিয়ে না থাকতে পারেন তবে বৈদিক কালের সাধারণ জনসমাজে — গোড়ার দিকে হয়ত নারী-মানসেই তাঁর ভাবনা স্নেহরস জাগিয়েছিল ঘরের শিশুর অচঞ্চল প্রতিরূপ হয়ে। কিন্তু সেকালে — সেকালে কেন একালেও অনেকদিন পর্যন্ত -- শিশু বিষ্ণু — কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত লীলাগুলিই সকলের মন আকৃষ্ট করেছিল। যেমন গোবর্ধন ধারণ, কালিয় দমন, পূতনা-বধ, যমলার্জুন ভঙ্গ ইত্যাদি। লৌকিক কথায় ও গাথায় এসব শিশু বীরকীর্তি ঘোষিত ও গীত তো ছিলই, তক্ষণ-শিল্পেও গ্রথিত ছিল। কিন্তু তখনও শিশু বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতি উপাসকের যে ভক্তি তাতে বাৎসল্যরসের সঞ্চার ঘটেনি। সে সঞ্চার ঠিক কবে থেকে ঘটতে শুরু করেছিল তা জানি না। মনে হয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বিষ্ণু-কৃষ্ণের উপাসনায় কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাৎসল্যরসের রঙ পাকা হয়ে ধরেছিল। এ ব্যাপার প্রথমে ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতে, এবং ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের মতো আমারও মনে হয় যে সাধকের উপাস্য বিষ্ণু-কৃষ্ণের বাল-গোপালে রূপান্তরে খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাব থাকা সম্ভব। রোমানাপন্থীদের মধ্যেই ঈশ্বর উপাসনায় বাৎসল্যরসের অর্ঘ প্রথম উপচিত হয় শিশু খ্রীস্টকে ঘিরে। দক্ষিণ ভারতে খ্রীস্ট ধর্ম অন্তত দেড়হাজার বছর আগে এসেছিল এবং সেখানে তা কখনও বিলুপ্ত হয়নি। শ্রীচৈতন্য বালগোপালের উপাসক ছিলেন। তাঁর দাদা-গুরু মাধবেন্দ্র পুরীকে বাৎসল্য ভক্তির সিদ্ধতম সাধক বললে বোধ করি ভুল হবে না। বালগোপাল বংশীধারী,

তিনি শিশুও বটেন কিশোরও বটেন। সুতরাং তাঁর সাধনায় মধুর রস বাদ পড়েনি। মাধবেন্দ্র ও চৈতন্যর ভাবে ও আচরণে একথার সমর্থন রয়েছে।

মহাভারত-হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ চরিতের আদ্যন্ত বর্ণনা আছে। সে বর্ণনায় কোথাও কৃষ্ণের এমন কোন পুরুষোচিত বীরকর্মের উল্লেখ নেই যা তাঁর কিশোর বয়সের পরে সংঘটিত হয়েছিল। শিশুপাল বধের মতো অলৌকিক দেবকার্যের কথা এখানে ধর্তব্য নয়। কৃষ্ণের শেষ মানব বীরকর্ম কংস ও চানুর দলন। কৃষ্ণের এসব বীরকর্ম লৌকিক গাথায় ও গানে আবদ্ধ ছিল এবং সেসব গাথা ও গানের প্রতিধ্বনি উপরে উল্লিখিত পুরাণগুলিতে ধরা আছে। চিত্রে ও নটকর্মেও এমন বীরকর্ম জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। বাসুদেব-ভক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন বীর-ভক্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল বলে ইচ্ছা হয়। এ কল্পনা নিয়ে আরও একটু অগ্রসর হলে আমরা ভগবদ্‌গীতোপনিষদের উপদেষ্টা ও তাঁর প্রোক্ত রাজযোগ — যাকে বীর সাধনাও বলা যায় — পৌঁছতে বাধা নেই। রাজযোগ সাধনায় যদি কোন রস থাকে তবে তার নাম দিতে পারি বীর-রস। এখানে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে পার্শোনাল রিলেসন থাকলে সামান্যই, আখড়াশালে মল্ল-শিক্ষায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের অতিরিক্ত নয়। হয়ত এটাই ছিল বৈষ্ণব আলঙ্কারিক উদ্দিষ্ট সখ্য রসের আদি রহস্য।

সেকালে মেয়েদের নিজস্ব একান্ত গোষ্ঠীতে কিশোর বিষ্ণু-কৃষ্ণকে নিয়ে আদিরসাত্মক কাহিনী অন্তত আভাষ ইঙ্গিতে প্রচলিত ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। যে সমাজে পুরুষরা যে দেবতাকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করে তাঁর বীরত্ব গাথায় মশগুল ছিল সেই সমাজেই, অনুমান করতে পারি, মেয়েরা সে দেবতাকে কোলের ছেলে ও বনের রাখাল কল্পনা করে ছড়া কেটে গান গেয়ে আনন্দ উৎসব করত। এই হল কৃষ্ণলীলায় মধুর রসের আদি উৎস। এখানে যিনি দেবতা তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বর নন, তিনি অসহায় শিশু, দুর্দান্ত বালক, গরুর রাখাল। ঈশ্বর উপাসনায় এই মধুরভাবের তুঙ্গতায় পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। যুগে যুগে কালে কালে কবি হৃদয় ভক্তের মর্মের আকুলতা-উৎসারে ধৌত হতে হতে তবেই বিষ্ণু-কৃষ্ণের আদিরসের ভাবনা থেকে দৈহিক প্রেমের অবলেপ সম্পূর্ণভাবে মুছে গিয়ে পরিপক্ক মধুর রসের পরিণতি ঘটেছে। এ কাজের শুরু দক্ষিণ ভারতে। এ কাজের শেষ মাধবেন্দ্র পুরীর চিন্তায় এবং চৈতন্যের চরিত্রে। এমন শেষের পরেও যদি শেষ বলে আরও কিছু থাকে তবে তার অনির্বচনীয় রেশ শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানে।

ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, এই প্রবন্ধে যে অভিমত দিয়েছি তা তথ্যাশ্রিত হোক অথবা নাই হোক, সে আমার নিজেরই ধারণা। সে ধারণায় সবাই যে সায় দেবে এমন প্রত্যাশা আমি করি না। কেননা,

"সত্যমিথ্যা কে করেছে ভাগ ?
কে রেখেছে মত আঁটিয়া ?"

অদ্বৈতাচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর ভোজনবিলাস

ডক্টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য

ন্যাসং বিবায়োৎপ্রণয়োহথ গৌরা বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোহস্মি ।।

যে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক প্রেমোন্মত্ত হয়ে বৃন্দাবন গমনের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছিলেন এবং ভ্রমক্রমে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতে করতে শান্তিপুরে এসে ভক্তগণের সঙ্গে বিলাস করেছিলেন সেই গৌরচন্দ্রকে নমস্কার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের এটি প্রথম শ্লোক। সমগ্র পরিচ্ছেদের বর্ণনায় বিষয় হল অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভুর বিলাসলীলা। সেই মহাপ্রভুকে নমস্কার করা হয়েছে যিনি 'ললাস ভক্তৈরিহ'। ললাস শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে লস্ ধাতু থেকে, যার অর্থ আলিঙ্গন ও ক্রীড়া। বিলাস শব্দটির মধ্যে এই দুই অর্থেরই আভাস আছে। বিলাস কথাটির মূল অর্থ আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উৎসব। খাওয়া এবং খাওয়ানো আমাদের সমাজে উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। মহাপ্রভু অদ্বৈত গৃহে আগমন করলে অদ্বৈতাচার্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বললেন --

প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ।।

ভিক্ষা কথাটি বৈষ্ণব পরিভাষায় ভোজন বা ভোজনের নিমন্ত্রণ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নিমন্ত্রণ কর্তাকে সর্বদাই বিনয় রক্ষা করে চলতে হয়; তিনি যদি বৈষ্ণব হন তাহলে স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে শাকান্নে নিমন্ত্রণ করাই রীতি। কখনো কখনো বন্ধুবান্ধবকে ডাল ভাত খেতেও বলি। ডাল বা ভাত যে এখানে বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হয় না আমন্ত্রিত সেটা বোঝেন। অদ্বৈত বলেন —

এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছি পাক।
শুখ রুখ ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক ।।

অর্থাৎ এক মুঠো ভাত বেঁধেছি আর ব্যঞ্জন বলতে দুটি, একটি সূপ বা ডাল আর একটি শাক। তাও শুখ (শুষ্ক) রুখ (রুক্ষ) তাতে না পড়েছে তেল না পড়েছে ঘি। কিন্তু 'আচার্যানী' এক বাটি জল আর একটুখানি 'শুখরুখ' শাক ভাজা দিয়ে মহাপ্রভুর সেবার আয়োজন করবেন এও কি সম্ভব? সীতাদেবী ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন। ভোজ্য তালিকাটি দেখে আমরা প্রাচীন বাংলার পাকশিল্প ও প্রাচীন বাঙ্গালীর রসনারুচির কিছুটা পরিচয় পাব। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের ঘরে আমিষ ওঠে না। কাজেই এ তালিকার সব খাদ্যই নিরামিষ।

মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আর একবার ভোজনলীলা বর্ণনা করেছেন। সার্বভৌমের গৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রণ। সেই উপলক্ষে বর্ণনা। এ তালিকাটি আরও বড়। রান্না

করেছেন ষাঠির মা। সার্বভৌমের কন্যার নাম ষাঠি। ভট্টাচার্য গৃহিনী তাই ষাঠির মা নামেই পরিচিত।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল ॥
ভট্টাচার্যের গৃহে সবদ্রব্য আছে ভরি ॥
যে বা শাক ফলাদিক আনিল আহরি ॥
আপন ভট্টাচার্য করেন পাকের সবকর্ম।
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম ॥

গৌড় এবং উৎকল দুই প্রদেশে যত রকমের স্বাদিষ্ট ভোজ্য সামগ্রীর প্রচলন আছে সার্বভৌম্য ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর জন্যে শ্রদ্ধাসহকারে সবই প্রস্তুত করলেন (১)। আমরা স্মরণ রাখব মহাপ্রভুর যে দুটি ভোজনবিলাস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি (মধ্য। তৃতীয় পরি) গৌড় এবং দ্বিতীয়টি (মধ্য। পঞ্চদশ পরি) উৎকলে।

ব্যঞ্জনের উপকরণের মধ্যে একালকার পরিচিত অনেক আনাজেরই দেখা যায় না। শাক সবজির মধ্যে নাম পাই এই কটির (২ এবং ৩), — বাস্তুক শাক, পটোল, কুম্মাণ্ড অর্থাৎ চালকুমড়া, মানকচু,, কাঁচ নিমপাতা, বেগুন, মোচা। ডালের মধ্যে 'মদগ' অর্থাৎ মুগের নামটাই পাওয়া যাচ্ছে। মাষকলাইয়ের নাম পাওয়া যায় বড়ার (১২ এবং ১৩) প্রসঙ্গ। তরকারিতে বড়ির ব্যবহার হত। ফুলবড়ি ভাজা হত এবং কুম্মাণ্ড বড়ি দেওয়া হত তরকারিতে। কুম্মাণ্ড বড়ি তৈরী করা হত পাকা চালকুমড়া দিয়ে। তিক্ত ব্যঞ্জনের জন্য শুক্তা ব্যবহার করা হত। নালিতা বা নিম বা অন্য কোনো তিক্ত স্বাদের পাতা শুকিয়ে রাখা হত, তারই নাম শুক্তা। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে এই অর্থে 'শুকুতা'র প্রয়োগ আছ। বাঙ্গাল মাঝি 'হারাইল শুকুতার পাত' বলে যে বিলাপ করেছিল সে কথা ভোলার নয়। শুকুতার মূল অর্থ শুকনো পাতা। তার থেকে অর্থ দাঁড়াল শুকতা দিয়ে তৈরী তিক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ। এ ব্যঞ্জনটি ঝোল জাতীয়। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে 'নিম্বশুকতার ঝোল' এর উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় পাকশালায় শুকতা বা শুকতুনির প্রাচীন ঐতিহ্য অদ্যাবধি বর্তমান। মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণে এই ব্যঞ্জন আজও অপরিহার্য। অবশ্য 'জলপানের' সঙ্গে শুকতার সংযোগ নাই। ভারতে তিক্তস্বাদের কিছু ব্যঞ্জন আমাদের কাছে প্রিয়। সেকালেও ছিল। বাস্তুকে বা বেথো শাকের স্বাদ তেতো। কাঁচ নিমপাতার সঙ্গে বেগুন ভাজা শীতের সময় একালেও ভাতের পাতে প্রথমে খাই। কৃষ্ণকীর্তনে শুকতা নামটা পাই না কিন্তু শুকতা জাতীয় ব্যঞ্জনের উল্লেখ আছে। বংশী শব্দে উন্মনা রাধা 'ছোলঙ্গ' — চিঁপর্আঁ নিমঝোলে' নিক্ষেপ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, বড়ুচণ্ডীদাসের আমলেও পটোলের ব্যবহার ছিল। ঝোলে ঝোলে দেওয়া হত কিনা জানি না কিন্তু ঘৃত ভাজা হত। আমরা ঘি পাই না কিন্তু তেলে ভাজা পটোল ভাতের সঙ্গে এখনও খাই। চরিতামৃতে ব্যঞ্জনের মসলার মধ্যে রাই মরিচের নাম আছে। তিক্ত ঝাল ব্যঞ্জনে রাই ও মরিচের বাটনা পড়ত। ঝাল তরকারিতে কৃষ্ণকীর্তনের রাধা দিতেন 'বেশোয়ার'। 'বেশোয়ার' এর মুখ্য উপকরণ মরিচ। ভাব প্রকাশে বলা হয়েছে—

দ্রব্যানী বেশবারস্য নাগবল্লী দলানি হি।
তপ্ত্বাংশ্চ লবঙ্গানি মরিচানি সমাগতঃ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত অন্যান্য ব্যঞ্জনের মধ্যে মোচার ঘণ্টের নাম পাই যা আজও আমাদের প্রিয়। দুগ্ধ কুম্মাণ্ড আর একটি ব্যঞ্জন। নারকেলকোরা দিয়ে চালকুমড়োর মিষ্ট ব্যঞ্জন আমরা মধ্যে-মধ্যে খাই। তার সঙ্গে দুধ দেওয়া হয় কিনা জানি না। দুগ্ধ কুম্মাণ্ড সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকলেও দুগ্ধ-মিশ্রিত

লাউয়ের তরকারী আমাদের খুব পরিচিত। সার্বভৌমের গৃহের ভোজ্য তালিকায় দুগ্ধতুম্বির নাম আছে।

মুগের ডালমুখ্য ব্যঞ্জনগুলির অন্যতম। অদ্বৈত এবং সার্বভৌম দুজনের বাড়িতেই 'মুদ্গ সূপ' রাঁধা হয়েছিল। ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে আরও অনেকগুলি উভয় তালিকাতেই স্থান পেয়েছে, মিষ্টান্নও তাই। তবে সার্বভৌমের ভোজ্য তালিকায় পদের সংখ্যা কিছু বেশী। উদাহরণের হিসেবে 'ছেনাবড়া', 'বড়ী ঘোল', 'বেসারি', 'লাফরা' এবং বিবিধ প্রকার 'শাকরা'র নাম উল্লেখ করা যায়। 'ছেনাবড়া' ছানা চটকে গোল গোল করে বড়ার আকার ভাজা। চৌকো চৌকো করে বরফি বা গজার আকারে কাটা হত না তার প্রমাণ আমাদের বাগ্‌বিশেষ (idiom) 'চোখছানাবড়া'। 'বড়ীঘোল' কি দইবড়ার প্রকারভেদ? 'বেসারি' ঝাল মসলা-সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিশেষ। বেসার-এর অর্থ বাটনা, ঝাল তরকারির উপযুক্ত বাটনা। বেশোয়ার-এর অর্থ আগে বলেছি। বেসার এবং বেশোয়ার উভয়েই মূল এক। কবিকঙ্কনে 'বেসার' পাই। "খইলের বেসার দিয়া ঝাল দিয়াছে দড়।" ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও বেসার শব্দের প্রয়োগ আছে, "নীরস করিয়া দিল সরস বেসার"। 'লাফরা' শব্দটি আমাদের অপরিচিত নয়। লোক মুখে এর অনেক রূপ, — 'নাফরা', 'লাফড়া', 'লাবড়া'। ওড়িয়া 'ন্যাবড়া' জগন্নাথের একটি ব্যঞ্জন প্রসাদের নাম। লাউ (লাবু) এই ব্যঞ্জনের অন্যতম উপকরণ বলে এই নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আরবী 'লফীফ' শব্দ তুলনীয়; অর্থ মিশ্র, পাঁচমিশালী; তাহা লাউ এবং পাঁচ রকম তরকারির ঘণ্ট; বিবিধ তরকারির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। "থোড় মোচা, মিঠাকুমড়া, শিম, মূলা, বেগুন ইত্যাদি তরকারি একসঙ্গে ডালের বড়া দিয়া রন্ধন করিলে যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় তাহারই নাম লাফড়া।" — প্রবাসী থেকে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে উদ্ধৃত। লাফড়া ব্যঞ্জনটি যে মহাপ্রভুর ভাল লাগত একাধিক জায়গায় তার উল্লেখ আছে। যেমন, — 'লাফরা খায়েন প্রভু ভক্তগণ হাসে' — চৈতন্যভাগবত। সার্বভৌমের বাড়িতে গৌরাঙ্গদেব লাফরা চেয়ে খেয়েছিলেন —

সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে॥

সার্বভৌমের স্ত্রী বিবিধ প্রকারের 'শাকর' পাক করেছিলেন। এই শাকরটি কি বস্তু? শাকর কথাটি দেখলেই শর্করাজাত মনে হওয়া স্বাভাবিক। কোনো কোনো স্থলে চিনি অর্থে শাকর শব্দের প্রয়োগও হয়েছে। যেমন, গোবিন্দদাসের পদে — "ক্ষীর, সর, নবনী, ছেনা, দধি, শাকর, দেয়ল সব রস সার"। জ্ঞানেন্দ্র মোহন 'শাকরা' এবং 'শাকরী' শব্দের অর্থ দিয়েছেন মধুরাম্ল, চাটনি। এই অর্থে কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁর অভিধানে সে কথার উল্লেখ নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শাকর'-এর অর্থ চিনি ছাড়া আর কিছুই দেন নি। কিন্তু 'শাকরা' শব্দের অর্থ মনে করেন চিনি ময়দার মিষ্টান্ন বিশেষ। 'শাকর' কথাটি একবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রযুক্ত হয়েছে। সেখানেও অর্থটি পরিস্কার হয়নি। বিরহখণ্ডে বড়াই কৃষ্ণকে বলছেন —

ভাত না খাইলি তবে তাঁহার কারণে।
শাকর খাইতে তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে॥

সম্পাদকের অনুমিত অর্থ — 'উপলখণ্ড, কঙ্কর বা বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা, কর্পরাশ'। যে প্রসঙ্গে শব্দটির প্রয়োগ তার সঙ্গে এই অর্থকে মেলাতে গেলে জোর করে মেলাতে হয়। ভাজার মধ্যে বেগুনের ব্যবহার ছিল। শীতের দিনে নিম্ব পত্রসহ ভৃন্ট বার্তাকী'র কথা আগেই বলা হয়েছে। বড়িও ভাজা হত, বিশেষত ফুলবড়ি। চাকাচাকা করে কেটে মানকচু ভাজা হত। কুমড়ো এবং মোচাভাজারও প্রচলন

ছিল। মাষকলাই এবং মুগের ডাল বেটে বড়া ভাজা হত (১৩)। বড়াকেও ভাজার পর্যায়েই ফেলা যায়।

খাবার শেষে চাটনি জাতীয় ব্যঞ্জন (৪ এবং ৫)। তার মধ্যে কোনটি মধুরাম্ল মিষ্ট টক, কোনটি বড়াম্ল বেশি টক। চাটনিও পাঁচ 'ছ রকমের। রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবা প্রসঙ্গে "কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার" মুখরোচক খাদ্যবস্তুর কথাও বলা হয়েছে।

মিষ্টান্নে হাত দেবার আগে মূল অন্নের কথা বলিনি। ভাতের প্রসঙ্গে শাল্যন্নের নামটা বারবার বলা হয়েছে। শালি ধানটা যে বঙ্গীয় ধান্যসমাজে এক সময় সর্বাধিক আভিজাত্য লাভ করেছিল তার প্রমাণ আছে লৌকিক ছড়ায়। শাশুড়ী ভোলানোর জন্যে যদিও 'উড়কি ধানের মুড়কি'র প্রয়োজন হত কিন্তু 'পথে জল খেতে' 'শালিধানের চিড়ে' নাহলে চলত না। শালি ধানের ভাত যে নিমাইয়ের প্রিয় ছিল তা শচীমার মুখেই শুনি। নীলাচল থেকে বিদায় দেবার সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের কণ্ঠ ধরে জননী প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন সেই ছত্রকটি এখানে উদ্ধৃত করি, —

নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্তি জ্ঞানে তোঁহা তাহা সত্য নাহি মানে।।
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত।।
নিম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ মণ্ড সার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার।।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাইয়ের প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন।।

শালি ধানের অন্নে পড়ত ঘি। মহিষা নয়, গব্য ঘৃত। ঘৃতের বর্ণ পীত (৬ এবং ৭)। পীত সুগন্ধি ঘৃত অন্নস্তূপ সিক্ত করে পাতার চারদিকে দিয়ে বয়ে যায় এমন ভাবে ঘি ঢালা হত।

মিষ্টান্নের মধ্যে কয়েকটি পিষ্টকের নাম পাই। আমরা একালেও যে পুলি পিঠে খেয়ে থাকি সেই পিঠে। তার কোনটিতে ক্ষীরের পুর, কোনটিতে নারকেলের। কলার বড়ার নাম পাই, এটিও পিষ্টক পর্যায় পড়ে। আর একটি বড়া আছে — কাঁজি বড়া। কাঁজি বা কাঞ্জি শব্দটি প্রাচীন বাংলায় পরিচিত, অর্থ পর্যুষিত অন্নের অম্লজল বা আমানি। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহার আছে, — "পাঁচমাসে কাঁজি বা করঞ্জায় যায় মন"। কাঁজি শব্দটির ইতিহাস কৌতূহলজনক। শব্দটি দক্ষিণ ভারত থেকে ওড়িষার মধ্য দিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। তামিলে একটি শব্দ আছে 'কাঞ্জি', অর্থ ভাতের ফেন। শব্দটি দাক্ষিণী ইঙ্গ ভারতীয় সমাজেও অনুপ্রবেশ করেছিল যার ফলে ইংরেজী অভিধানেও স্থান পেয়েছে। ইংরেজী 'congee house' কথাটির অর্থ সামরিক কয়েদখানা। কয়েদীদের ফেন খেতে দেওয়া হত বলে নাকি এই নাম।

একটি মিষ্টান্নের নাম পাই দুগ্ধলকলকি (১৬, ১৭)। শব্দটি চলন্তিকায় নাই, চলন্তিকায় থাকার কথাও নয়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রও ধরেন নি। বঙ্গীয় শব্দকোষে দুগ্ধ প্রসঙ্গে দুগ্ধ লকলকি ধরা হয়েছে, অর্থ দেওয়া হয়েছে 'পিষ্টক' (?)। আভিধানিক পিষ্টক বলেই অনুমান করেন কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন। চরিতামৃতের একটি টীকায় এই শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে — 'অলাবুসহ দুগ্ধের পাকবিশেষ'। এটিও অনুমান বলে বোধ হচ্ছে। লকলকি আমরা বাল্যকালে খেয়েছি। মেদিনীপুর অঞ্চলে অর্ধ শতাব্দী

আগেও এই মিষ্টান্ন প্রস্তুত হত। ময়দার ছোট ছোট লেচি করে লুচির মত বেলে দুধে সিদ্ধ করে এই খাবারটি তৈরী হত।

পরান্ন (১৪ — ১৫) একটি অপরিহার্য মিষ্টান্ন। পায়স ছাড়া ভোজ পূর্ণাঙ্গ হয়না। পায়সকে সুস্বাদু করার জন্য তাতে ঘি দেওয়া হত। এছাড়া দধি, সন্দেশতো (১৯, ২০) ছিলই। ঘন দুগ্ধ (১৮, ১৯) তার সঙ্গে আমের রস সুখাদ্যরূপে সেদিনও গণ্য ছিল। কলাও একটি সমাদৃত ফল (১৬, ১৯, ২০)। তারমধ্যে চাঁপাকলারই খ্যাতি (১৯, ২০) ছিল বেশী। দুধ চিড়া দিয়ে আজও আমরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে জলযোগ করি। পাঁচ'শ বছর আগেও দুগ্ধ চিড়ায় (১৬, ১৭) আদর ছিল। দুধ চিড়ের সঙ্গে কলা (১৬) মিশিয়ে খাওয়া হত।

অন্নভোজের উপকরণরূপে পায়স পিষ্টক দধি সন্দেশের মত দুধ চিড়াও কেন এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। তার উত্তর সহজ। ভক্তকবি এখানে সামাজিক ভোজের বর্ণনা করেননি নারায়ণের ভোগ বর্ণনা করেছেন। নারায়ণকে যে ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে মধ্যখণ্ডের এই দুটি পরিচ্ছেদে। তৃতীয়ে দেখি আচার্যানীর পাক সমাপ্ত হলে 'বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য আপনি'। পঞ্চদশে দেখি মহাপ্রভু ভোগের সমারোহ দেখে সার্বভৌমকে বলেছেন —

কৃষ্ণে ভোগ লাগায়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী মঞ্জরী॥
ভাগ্যবান তুমি সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগায়াছ এতাদৃশ ভোগ॥

রাধাকৃষ্ণকে যে ভোগ লাগানো হয়েছে দুই পরিচ্ছেদে তারই বর্ণনা। মহাপ্রভুকে যা পরিবেশন করা হয়েছে তার কিছুই স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত হয়নি, সবই দেবতার প্রসাদ। আর দেবতাকে ভক্ত যখন ভোগ নিবেদন করেন তখন যা কিছু ভোজ্য সবই একসঙ্গে নিবেদন করেন। সেক্ষেত্রে সামাজিক ভোজের খাদ্যতালিকার পারমপর্য বা সংগতির প্রশ্ন ওঠেনা। তাই অন্ন ব্যঞ্জনের সঙ্গে দুধ চিড়ার আছে, ছানা চিনি নারকেলকোরাও আছে।

স্বগৃহে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্ন ছাড়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথের প্রসাদও আনিয়েছিলেন।

অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিল॥ মধ্য পঞ্চদশ।

এতগুলি ভোজ্যবস্তু পরিবেশনের জন্য পাত্রের প্রয়োজন। গৃহস্থের বাড়িতে কাঁসা-পিতলের থালা বাটির ব্যবহার প্রচলিত। ধনীর গৃহে সোনা রূপারও চলন ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের ঘরে ধাতুপাত্র সুলভ নয়। অদ্বৈতাচার্য-র গৃহে কৃষ্ণের একটি ভোগ দেওয়া হয়েছিল ধাতুপাত্রে।

তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সমকরি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্র পরি॥

বাকী সব পাতায়। সে পাতা (৮, ৯, ১০, ১১) হল 'বত্রিশা আটিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাত'।

আঙ্গটিয়া বা আঙ্গট — অর্থ অচ্ছিন্ন, শব্দটি অঙ্গর্তে থেকে আগত। এটি সুনীতিবাবুর মত। কিন্তু আগুট শব্দ আমরা একালেও ব্যবহার করি অচ্ছিন্ন অর্থে ততটা নয়, যতটা পাতার অগ্রাংশ অর্থে। হিন্দি ও মারাঠীতে আঁন্ট বলে একটি শব্দ আছে বাংলায় যার নিকটতম উচ্চারণ হবে আঁঅট, অর্থ প্রান্ত বা অগ্রভাগ। আঙ্গট বা আগুটের সঙ্গে এই শব্দের আশ্চর্য মিল — অর্থ এবং উচ্চারণ উভয় দিক দিয়েই লক্ষনীয়। আটিয়া কলা — যে কলার বীজ থাকে, বিচি কলা। এই কলাগাছের পাতা আকারে বড় হয়। বাত্রিশা — যে গাছে বাত্রিশটি পাতা হয়। একজন টীকাকার বলেছেন — যে গাছে বাত্রিশটি খোলা। ভোজ্য পাত্র হিসেবে কলার খোলার বিশেষ ব্যবহার ছিল। কলার খোলার ডোঙ্গা (১০, ১১) তৈরী করে তাতে ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হয়েছে অদ্বৈত এবং সার্বভৌম উভয়ের গৃহেই। অদ্বৈত 'পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিয়া' তিন ভোগের আশেপাশে রেখেছিলেন। নীলাচলের ভোজে কেয়াপত্রের (১০) ব্যবহারও দেখি। অদ্বৈতের গৃহে 'দোনা ব্যঞ্জনে ভরি' দেওয়া হয়েছে। দোনা অর্থাৎ পাতার ঠোঙা। পরমান্ন দেওয়া হয়েছে মৃৎকুণ্ডিকায় (১৪) ভরে। দধিও মৃৎকুণ্ডিকায় (২০) পরিবেশিত হয়েছে।

মুখশুদ্ধি করে ভোজন বিলাসের পরিসমাপ্তি। সন্ন্যাসী তাম্বুল গ্রহণ করেন না। অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে আচমন করি মুখশুদ্ধির জন্যে —

লবঙ্গ এলাচিবীজ উত্তম রসবাস।
তুলসী মঞ্জরীসহ দিল মুখবাস ॥

সার্বভৌমের গৃহে ও ভোজনান্তে

আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসী মঞ্জরী লঙ্গ এলাচি সুবাস ॥

লবঙ্গ এলাচিবীজ উত্তম রসবাস। রসবাস কি এলাচিবীজের বিশেষণ? একটি অভিধানে রসবাসের অর্থ করা হয়েছে সরস ও সুগন্ধ অন্যত্র বলা হয়েছে রসযুক্ত ও সুগন্ধি মসলাবিশেষ। 'রসবাস' কথাটির চরিতামৃতে আরও একবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন — 'রসবাস গুড়ত্বক আদি'। এখানে রসবাস বিশেষণ নয়, সুতরাং মসলাবিশেষ অর্থই গ্রহণীয়। এখন প্রশ্ন কোন মসলা? জনৈক টীকাকার মনে করেন কাবাব চিনি। অদ্বৈত এবং সার্বভৌমের আবাসে প্রভুর ভোজনলীলা সমাপ্ত হল। গৌরাঙ্গ গোবিন্দের মহাপ্রসাদ আমরাও ভক্তিবিনম্র অন্তরে নতশিরে স্পর্শ করে বলি —

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে সেইজন।
অচিরাতে পাই সেই চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

সেকালের চৈতন্য একালের চৈতন্য

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত

॥ এক ॥

'আজও গৌরাঙ্গ সেই লীলা করছেন, কোনো কোনো ভাগ্যবানই শুধু তা প্রত্যক্ষ করেন'। —চৈতন্য-জীবনীকার একটা বিশেষ ধর্মীয় তাত্ত্বিক বিচারের বশে এই কথাগুলি বলেছিলেন।[১] কিন্তু আমার কাছে ঐ পয়ারটির সরল অর্থই গ্রাহ্য এবং তাকে একটি সার্থক ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎবাণী বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য উক্ত তাত্ত্বিক বিশ্বাসে আমার আস্থা নেই। যদিও এই প্রত্যক্ষ সত্যে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে পাঁচশ বছর আগে চৈতন্য বর্তমান ছিলেন কিন্তু আজও এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে বাঙালীর মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা যায় যা মধ্যযুগের অন্য কোনো সাধক বা মনিষী সম্বন্ধেই খাটে না।

ধর্মপ্রবক্তরা গুরু পরম্পরায় শিষ্যদের কাছে কিছুটা থেকে যান। সেটা অবশ্য সাম্প্রদায়িক থাকা, এবং ক্রমে তা একটা মাল্যভূষিত ছবি হয়ে দেয়ালে লটকানো হয়। বোধ হয় সে-কারণেই ছোট বড় অনেক গুরুই অবতার হিসেবে গণ্য হতে আপত্তি করেন না, কেউ এই অভিধা অস্বীকার করলেও শিষ্যরা শোনে না। পথ-প্রদর্শকরূপে গুরুর যে ভূমিকা তা এত প্রত্যক্ষ যে তারজন্য একজন বেঁচে-থাকা মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু ধর্মপথের লক্ষ্য চিরকালই দূরবর্তী ও গহন। ধর্মপ্রবক্তাকে সেই সাধ্যবস্তু করে তুললে তাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা পাকা ব্যবস্থা হয়, অন্তত যতকাল ঐ ধর্মগোষ্ঠীর আয়ু থাকে।

চৈতন্যকেও এইভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব সেইসব চেষ্টাকে ছাপিয়ে অত্যন্ত জোরাল হয়ে রয়েছে ; তাঁকে বাঙালী অনেক সরাসরি আজও অনুভব করতে পারে। বাংলার জীবনে-ভাবনায় পাঁচশ বছর ধরে চৈতন্যের অবস্থানকে ঐতিহাসিক তাৎপর্যে এবং যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিয়ে বুঝে নিতে হবে।

খুব সংক্ষেপে সূত্রাকারে এবিষয়ে আমার চিন্তাকে বিন্যস্ত করছি —

১। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের বাইরেও অন্য নানা ধর্মগোষ্ঠীতে বৈষ্ণব ভাবনার ও ভক্তিবাদের প্রভাব পড়েছে। বাঙালী হিন্দুরা শাক্তশৈব - বৈষ্ণব প্রবণতা নিরপেক্ষভাবে পঞ্চোপাসক হয়ে ওঠাই বেশি পছন্দ করেছে। কালী শিব বা রাধাকৃষ্ণের পুজোয় কোনো বিরোধ জনসাধারণের মধ্যে প্রায় কখনও দেখা যায় নি। ফলে চৈতন্য বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন বাইরেও ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রের কাছে পূজ্য বলে গৃহীত হয়ে আসছে।

২। চৈতন্য ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সর্বভারতীয় ভক্তিবাদী ধারাগুলির অনেক দিক থেকেই মিল ছিল। ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ শাস্ত্রীয় আচার বন্ধনের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। এ কারণে সাধারণত অনভিজাতদের মধ্যে তার আবেদন অনেক ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যপন্থারও বাংলার নিম্নকোটির মানুষের নিজ ধর্ম হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। আবার সূফী সাধনার কিছু অংশের আত্মীকরণ ঘটায় মুসলমান সমাজের কোনো কোনো স্তরে এর আহ্বান পৌঁছেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করার যে চৈতন্যমতবাদীরা অল্পকালের মধ্যেই অভিজাত মননশীলদের তাত্ত্বিক নেতৃত্ব ও আচরণগত বিধিনিষেধের মধ্যে চলে যান। এর ফলে সমাজের উচ্চস্তরও চৈতন্যকে মেনে নিতে সংকোচ বোধ করে নি।

৩। বাইরে থেকে স্বভাবত মনে করা হয় বৈষ্ণবী ভক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতার মধ্যে বিরোধ আছে। বিরোধ যে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার আদিম তান্ত্রিক বিশ্বাস ও শক্তিতত্ত্বকে খুব গভীর থেকে সূক্ষ্মভাবে রাধাভাবনায় মিশিয়ে নেওয়া হয়েছিল।[২] এর ফলে প্রচলিত লোকায়ত বিশ্বাসের স্তরে এই নব ধর্মের প্রবেশ অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হতে পেরেছিল।

৪। বাংলার লোকধর্মের নানা শাখা — সহজিয়া বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, কর্তাভজা সম্প্রদায়, বাউল প্রভৃতি এখনও বেঁচে আছে — তাদের বিশিষ্ট আচার, সাধনরীতি নিয়ে আজও তারা যতটা সম্ভব গোষ্ঠীবদ্ধ। এরা অনেকেই তো চৈতন্যপথের অনুগামী বলে দাবি করেন। ক্লাসিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সে দাবি না মানলেও ওদের মধ্য দিয়ে চৈতন্য বাংলার মাটিতে বহুদূর পর্যন্ত এবং অনেক গভীরে শিকড় ছড়িয়ে বসে আছেন।

৫। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য জগতে একটা বিপুল আয়োজন হয়েছিল। যেমন —

(ক) আগে থেকে প্রচলিত থাকলে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য বিষয়ে ভাবে রচনারীতিতে নতুন মাত্রা পেল।
(খ) চরিত কাব্য একটি সম্পূর্ণ নতুন শাখা। চৈতন্যজীবনী নিয়ে শুরু, অন্য অনেক মহান্তকে নিয়েও লেখা হল অনেক বই।
(গ) কৃষ্ণের প্রণয়লীলা নিয়ে কাহিনীকাব্যের প্রসার।
(ঘ) পদসংকলন গ্রন্থ রচনা।
(ঙ) রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদে ভক্তিবাদের আরোপ।
(চ) মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব ভাবব্যাকুলতার অনুপ্রবেশ।
(ছ) বৈষ্ণব পদসংকলনের প্রকাশ।
(জ) বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে শাক্ত কবিতার জন্ম।
(ঝ) বাউল বা সূফী ফকিরদের গান, এমন কি কবিগানে ও বৈষ্ণব কবিতার রূপ ও ভাবের ব্যাপক অনুসরণ।

এইসব সূত্র ধরে ধর্মসাধনার বাইরে সাহিত্যের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে যাঁরা সাহিত্য নিয়ে ভাবে তাঁদের মধ্যে চৈতন্য আজও জীবন্ত। কেউ কৃত্তিবাস পড়তে গেলে চৈতন্যকে না ভেবে পারে না, অথবা ষোড়শ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের চর্চা যে করবে 'চৈতন্যভাগবত' বইটির সাহায্য তাকে নিতেই হবে।

৬। সাহিত্য ছাড়া বাংলার সংস্কৃতির অন্য নানা দিকে চৈতন্যাশ্রয়ী নতুন সংযোজন অল্প নয়। যেমন —

(ক) নামকীর্তন, নগরসঙ্কীর্তন, পালাকীর্তন — কীর্তনগানের বিচিত্র আদর্শ, — যা এখনও একটা জনপ্রিয় সাঙ্গীতিক রীতি।
(খ) পরবর্তী বাউল বা কবিগানের সাঙ্গীতিক রীতি ; অনেক নতুনত্ব থাকলেও পরিবেশনের দিক থেকে কীর্তন-পদ্ধতির অনুসরণ।[৩]
(গ) পূর্বোক্ত গানগুলির সহযোগী নৃত্য।
(ঘ) প্রচলিত গ্রামীন নাট্যগীতির পরিশীলিত রূপ স্বয়ং চৈতন্যের অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত

হয়েছিল। অনুমেয় কৃষ্ণলীলার অভিনয়িক রূপ এর ফলে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল।

উল্লিখিত [৬ (ক)] এবং [৬ (খ)] পরবর্তী বাংলা গানে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে হলেও আজও এই প্রভাব লোপ পায়নি।

৭। মননশীলতার ক্ষেত্রে চৈতন্যপন্থা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সমকালে অবশ্যই উজ্জীবিত করেছিল। নৈয়ায়িক নিমাই তীক্ষ্ণ মেধায় নবদ্বীপকে বিদ্যুৎপৃষ্ট করে তুলেছিলেন। পরে জ্ঞানমার্গে তাঁর আর কোন আকর্ষণ ছিল না বলে শোনা যায়। সে কারণে বৈষ্ণব তত্ত্বের অনেক কিছু সরাসরি তাঁর প্রবর্তন না হওয়াই সম্ভব। হয়তো কোনো কোনো সূত্র দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিল। যেখান থেকে যা-ই আসুক তাঁকে কেন্দ্র করেই বহুমুখী চিন্তনের এক বৃহৎ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ফলে —

(ক) বেদান্তের ব্যাখ্যানে একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক মত গড়ে ওঠে, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব'।

(খ) পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সাধনতত্ত্ব বিধিবদ্ধ হল — 'সাধ্যসাধনতত্ত্ব'। যা ছিল একটা সহজ হৃদয়াকুতিমূলক ভগবদ্‌মুখিতা তার গতি বদলে গেল — পণ্ডিতজনের ভাবনার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বহুমুখী তত্ত্ববোধ বিকশিত হয়ে উঠল। যেমন — রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, গৌরাঙ্গতত্ত্ব প্রভৃতি।

(ঘ) প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসরণে, কিন্তু তার মানবিকতাকে সংহরণ করে—আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে একটি নতুন রসশাস্ত্র গৌড়বঙ্গের ভাবুকদের মনীষার নিদর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এইভাবে যে মননশীলতার ব্যাপক চর্চা ঘটেছিল তার রেশ এখনও লোপ পায় নি। বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর বাইরেও দার্শনিকতার চর্চায় বা রসবাদের ব্যাখ্যানে যারা উৎসাহী তাদের অনিবার্যভাবে বারবারই চৈতন্যপন্থীদের ভাবনা-চিন্তার কাছে পৌঁছতে হয়।

উল্লিখিত সূত্রগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে সেকালের চৈতন্য একালেও দাপটের সঙ্গে বেঁচে আছেন।

॥ দুই ॥

চৈতন্যপন্থা যে সব সূত্র ধরে উচ্চ ও নিম্নকোটিতে ছড়িয়ে ছিল এবং এখনও নানাভাবে প্রত্যক্ষে — পরোক্ষে প্রভাব ও আগ্রহ ছড়িয়ে রেখেছে তার মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা ছিল। অনেকটা দুর্ণিরীক্ষ, কিন্তু অনুমান করা যায় এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। এবং সেই গূঢ় সংঘাতের ফলে একটি ধারা ক্রমে দুর্বল, অন্য ধারা প্রধান হতে থাকে।

যারা দ্বন্দ্বটা না দেখে সমন্বয়ের উপরে জোর দিতে চায়, তারা ঐ দুই কোটির বিরোধ যে অর্থনৈতিক শিকড় থেকে এই সত্য দেখেন না। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সমন্বয় যদি শোষক বা শোষিত কোনো সমশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘটে তো তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে। কিন্তু বিপরীত প্রান্তের অর্থনৈতিক শ্রেণী যাদের মধ্যে শোষণের সম্পর্ক (প্রত্যক্ষত শোষক-শোষিত হবার প্রয়োজন নেই, এটা শ্রেণীস্বার্থের সমস্যা ; নিজ নিজ শ্রেণীর প্রতি সে-আনুগত্য প্রায় সর্বব্যাপী) তাদের এক ধর্মে মেলান হলে, বুঝতে হয় নেতৃত্ব রয়েছে কাদের হাতে। কারণ সমন্বয়ী আদর্শ সেই শ্রেণীর অভিপ্রায়ের অভিমুখীন হয়ে পড়ে। এ একরূপ অনিবার্য, যদিও বহুক্ষেত্রে তা গুপ্তভাবে সক্রিয় থাকে।

ধর্মীয়-আচারসর্বস্বতা, বর্ণগত অধিকার ভেদ এবং জ্ঞানমার্গের শুষ্ক কঠোরতা তথা জীবনবিমুখতার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সম্ভাবনা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিবাদ ব্যাপ্ত হয়েছিল। চৈতন্যের মধ্য দিয়ে তা বঙ্গদেশে আলোড়ন তুলেছিল। লোকাশ্রয়ী তান্ত্রিকতার শক্তিবাদকে ভক্তির মধ্যে আত্মীকরণ কিংবা ইসলামী সূফীদের ভাবকে বৈষ্ণবতায় সমন্বয় করা, হরিনামের দৌলতে নিম্নকোটিকে মর্যাদাদান — এই সব সমন্বয়ী কার্যকলাপ গণমুখী ছিল, যদিও নেতৃত্ব তখনও উচ্চবর্ণের — কিন্তু বর্ণমাহাত্ম্য প্রচারের কোনো চেষ্টা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায় নি। কিন্তু অতিদ্রুত একটা নতুন ধরনের আচার ও বিধিনিষেধ, অতি সূক্ষ্ম ও জটিল দর্শন ও মনন প্রাধান্য চৈতন্যধর্মের চরিত্রকে বদলে দিতে থাকে। উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব — নেতৃত্ব শুধু নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠিত হতেও সময় লাগে নি। নবদ্বীপের প্রধানেরা অনেকেই গৃহস্থ ছিলেন। পুরীতে কিংবা বৃন্দাবনে কঠোর সন্ন্যাসই অনুসৃত।

নবদ্বীপের চৈতন্য এবং পুরীর চৈতন্যই শুধু পৃথক নন, নবদ্বীপের মোহান্তরা এবং পুরীর পার্ষদেরাও মূলত ভিন্ন প্রকৃতির। সমাজ বাস্তবতা থেকে শিকড় উপড়ে নিয়ে ভাববিভোর আত্মমগ্ন সন্ন্যাসের স্তরে এই পরিবর্তনের[৪] কারণ খোঁজা দরকার। নারী বিষয়ক বিচারহীন বিমুখতা, রাজার সংস্পর্শ থেকে (প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত) দূরত্ব রক্ষা[৫] ভারতীয় ধর্ম-সাধকের সনাতনী আদর্শ। সমাজতাত্ত্বিক বিচারে এ হল সুনিশ্চিত পশ্চাদপসরণ। চৈতন্যোত্তর বৃন্দাবনী তত্ত্ববিলাসে জনসংযোগহীন দুরূহ পাণ্ডিত্যে এই আন্দোলনের সামাজিক ভূমিকা নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আর একটি ধর্মমাত্র হয়ে উঠল এবং সব রকম সামাজিক দায় থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে ফেলল।

এর ফলে বৈষ্ণবতা দুটি স্পষ্ট পৃথক অংশে ভাগ হয়ে গেল —

(১) ক্ল্যাসিকেল,

(২) লৌকিক।

আশাকরি, এধরনের নামকরণে কেউ অপত্তি করবেন। এবং এই বিভাগ এত গভীর ও সর্বাত্মক যে এদের দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের আর সুযোগ রইল না।

ক্লাসিকাল বৈষ্ণবতার ধারা বৃন্দাবনের তাত্ত্বিক আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বের অনুগামী, শাস্ত্রীয় আচারে পরিশীলিত ও গণ্ডীবদ্ধ। -

অপর ধারাটি আসলে বহু শাখায়িত, অথবা বলা যায় সদৃশ বহুধারার একটা সাধারণ আদর্শ। একান্ত লোকস্তরের। সেখানে আছে সমাজের প্রান্তবাসী নানা শ্রেণীর মানুষ — হিন্দু, মুসলমান বা তাদের মিশ্র কোন রূপ, — আউল বাউল ফকির, নেড়ানেড়ি, কর্তাভজা, নানা গোষ্ঠীতে সংবদ্ধ সহজিয়া বোষ্টম। সেখানে তত্ত্ব যেটুকু আছে তা দেহাশ্রয়ী, এক ধরনের মুক্ত দাসত্য। এরা চৈতন্যকে নিজেদের মতো করে নিয়েছে, তবে ঐ সব ধর্ম গোষ্ঠীই — কোন সামাজিক সংগঠন নয়। কিন্তু এরা আদি চৈতন্যপন্থার মধ্যে নিহিত জনমুখী ধর্মীয় প্রতিবাদের কিছু অবশেষ বহন করছে।

চৈতন্য-বিষয়ে আগ্রহী, সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাইরেকার — একালের মানুষ আমরা, এক্ষেত্রে মধ্যযুগের একটি ধর্মান্দোলনের মানবিক তথা অংশত বৈপ্লবিক সম্ভাবনার নিষ্ফলতার পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক।

॥ পদটীকা ॥

[১] অপ্রকটে কৃষ্ণলীলার পাশে পাশে নিত্য চলছে চৈতন্যলীলাও — অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আস্বাদন। বৃন্দাবনী তত্ত্বের প্রভাবে এটাই হল বৈষ্ণবী বিশ্বাস।

[২] অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' দ্রষ্টব্য।

[৩] ৫নং সূত্রে বাউল-কবি ইত্যাদির সাহিত্যধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, ৬নং সূত্রে গান হিসেবে এদের কথা ভাবা হয়েছে।

[৪] নবদ্বীপের চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার — সামাজিক দুষ্কৃতি দমন ও ন্যায়-ধর্মের প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ্য। সহকর্মীরা সেই কর্মকাণ্ডের সৈনিক। নীলাচলের মহাপ্রভু নিজেই নিজের প্রেমে মগ্ন। পার্ষদদের মঞ্জুরী গোপকিশোরীর সেবাময়ী প্রণয় ব্যাকুলতার ভাব।

[৫] রাজা এবং রাজশক্তি রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গণমুখী হতে পারে।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"ধমার্থ কাম মোক্ষানাম্ উপদেশ সমন্বিতম্।
পুরাবৃত্ত কথাযুক্তম্ ইতিহাস প্রেক্ষতে ।।"

ইতিহাসের এই সর্বাত্মক সংজ্ঞায় বিচার করলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ইতিহাস স্রষ্টা যুগপ্রবর্তক। আমরা অবতারবাদে বিশ্বাস করি বা না করি চৈতন্যদেব ইতিহাসের মহানায়ক।

কালে নাকি সবই জীর্ণ হয়। অবশিষ্ট থাকে ইতিহাস যার পরিশিষ্ট ঐতিহ্য। সম্প্রতি ইতিহাস দর্শনের দিক কোণের পুর্নবিচার হচ্ছে। সে তো হবারই কথা। এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ বস্তুবাদী মনন চিন্তনের যুগে যুগে ব্যক্তি মানস যেন নিতান্তই গৌণ। ব্যক্তি, উপলব্ধি অনাবশ্যক ভাববিলাস, তার কারণ, তার পরিমাপক কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র নেই। তাই সে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন অনুসন্ধান করলে একটি অনির্বচনীয় রহস্যঘন প্রাণ সত্ত্বার আবিস্কার যেমন দুর্লভ উপসম্পদ নয়, তেমনি স্থান কাল নিবদ্ধ ঐতিহাসিক বস্তুবাদও অমিল নয়।

শ্রীচৈতন্য দিব্যজীবনের প্রতীক ভাববিগ্রহ। মুস্কিল হল Anthropomorphic বিচারে। কিন্তু সেও বোধ হয় বিচ্ছিন্ন আকস্মিকতা নয়। সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের গতিপথে মর্ত্যলোকে নরমানুষের আবির্ভাব অন্তর্ধান যদি বিস্ময়কর না হয়, তাহলে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানও সংশয়াতীত। যা নিয়ে বিতর্ক, তা হল সাধারণ জীবন ও দিব্যজীবনের প্রভেদ নিরূপণে। যাঁরা লোকোত্তর দিব্যভাবনায় অনভ্যস্ত নন, তাঁরা পরানুভূতিতে প্রাজ্ঞ, লৌকিক সংজ্ঞায় "বিশিষ্টে চ বিশিষ্টতাম্।

ইতিহাসের আদিকাল থেকে এক জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের আবির্ভাব স্বপ্নে বিভোর ঋষিকুল অমৃতের পুত্রকে সম্বোধন করে চৈতন্য মন আত্মোপলব্ধির সন্ধানে মৃত্যুঞ্জয়ী মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

"ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যপন্থা বিদ্যতেহয়নায়।"

মহাভারতের শান্তিপর্বে বলবীর্য সমন্বিত কল্পুরুষের স্তবাকারে অনুরূপ একটি শ্লোকের সন্ধান মেলে—

"মহতস্তমসোপারে, পুরুষহ্যোবতেজসম্
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি, তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ।"

তাৎপর্যগত বিচারে শ্লোকটির আবেদন সর্বকালীন, সার্বজনীন। গীতায় শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণীর দ্যোতক ও স্মারক "ধর্মঃ সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। অধুনাযুগের রবীন্দ্রোক্ত মহাজীবনের আবাহন "ঐ মহামানব আসে," বলে নবজীবনের আশ্বাসে মানবঅভ্যুদয়ের জয়ধ্বনি। রচনাটির কাল উনিশ'শ একচল্লিশ খ্রীস্টাব্দ (১৯৪১)। ঘটমান মহাযুদ্ধের দুর্বার ঘূর্ণাবর্তে সংকটাস্তীর্ণ মানুষের জীবন। আর্ত মানবতা সংশয় বিহ্বল। পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিনের আশায় সকলের রুদ্ধশ্বাস দিন গনা।

পূর্বাপর ইতিহাস পরিকল্পনায় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকে একটি আকস্মিক বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে মনে করা ঐতিহাসিক বিবেচনায় সংগত হবে না। কার্য কারণের সন্নিবেশে পঞ্চদশ শতাব্দী একটি কালান্তরের সূচক বলে চিহ্নিত। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে Constantinople-এর পতন থেকে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে Bosworth-এর যুদ্ধ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অবধারিত নবযুগের নির্দেশক। তেমনি ১৪৯২ থেকে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের আমেরিকা ও ভারত আবিষ্কারের পরম্পরা স্থান-কালের ব্যবধান সংকোচনের সূচক। অল্পদিনের ব্যবধানে অনুরূপ ঘটনা সমবায় যেন কোন ইতিহাস নির্দিষ্ট ভবিতব্যতার ইঙ্গিত।

মধ্যযুগের জীবনাদর্শে সমাজ ছিল ধর্মাশ্রিত। রাজনীতি ছিল সামন্ত শাসিত। আধুনিক কালের সূচনায় এ-দুয়েরই রূপান্তর ঘটল একদিকে (Theocentricism বা ধর্মকেন্দ্রিকতা থেকে Anthropocentricism বা মানবমুখীনতার দিকে মানুষের ক্রমোত্তরণ), আর একদিকে সামন্ততন্ত্র থেকে জাতীয় রাজতন্ত্রের ক্রমবিবর্তন, সমাজ ও রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এনে দিল। কালের বিচারে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব লগ্ন নবজীবনের প্রতিফলক, মানবতাবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ বাতাবরণের সৃষ্টি করেছিল, যার ক্রমপরিণতি হল পরমত সহিষ্ণুতা, সাম্যবোধ ও ইহলোকমুখী সাম্যদর্শন। মানবতাবাদ (Humanism), যুক্তিবাদ (Rationalism), প্রকৃতিবাদ (Naturalism) ও আশাবাদ (Optimisim) সমসাময়িক ভাবরাজ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করল। কল্পনার স্বর্গরাজ্য মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হল। শিল্প-সাহিত্যে নব-যুগের প্রতিফলন সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ সমাজচেতনা এনে দিল। সূচনা হল মানব বন্দনার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে কবি কল্পিত "মানব বন্দনার"।

নমি আমি প্রতিজনে অদ্বিজচণ্ডাল, প্রভু কৃতদাস,
সিন্ধু মূলে জলবিন্দু, বিশ্ব মূলে অনু, সমগ্রে প্রকাশ ॥
নমি কৃষি তন্তুজীবী স্থপতি তক্ষণ কর্ম-চর্মকার।
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড, দৃষ্টি অগোচরে বহ অদ্রিভার ॥
কতরাজ্য, কতরাজা গড়িছে নীরবে, হে পূজ্য, হে প্রিয়।
একত্বে বরেন্য তুমি, স্মরেন্য একেকে, আত্মার আত্মীয় ॥"

এই মানবতাবাদী দর্শনে জন্ম নিল ভক্ত-ভগবান তত্ত্ব, নির্মিত হল ঐশী মানবিক যোগসেতু, কল্পিত ভাগবতী তনু, যার মূলে রয়েছে অপার 'অপরিমেয় জীবন রসাভিসিক্ত মনোময়, প্রাণময়, গুণময়, রূপময়, রসময়, আনন্দময় জীবনৈশ্বর্যের দুজ্ঞেয় ব্যাপ্তি; অতলস্পর্শী গভীরতা। প্রেমধর্ম বাহ্যিক আড়ম্বর বিমুখ সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, কান্তা ভাবাশ্রিত। আর শ্রীচৈতন্য হলেন জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের ঐকতান সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ দিব্যজীবনের ধারক ও পরিবেশক। এই প্রকল্পে তাঁর সাথী ব্রতী হলেন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য পূর্বসূরীগণ। গড়ে উঠল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। যারা শ্রবণে-মননে, ভজনে-পূজনে ও অবিরাম সংকীর্তনে বিলোলেন প্রেম — "অচণ্ডালে ধরি দেয় কোল"। মানবতাবাদের প্রসার ঘটল আসমুদ্র হিমাচল। সমান্তরাল কালে আউল, বাউল, দরবেশ, সুফী, সহজিয়া, মরমিয়া সম্প্রদায়ের সহাবস্থান এই কালটিকে লোকায়ত ধর্মের সহবৎ দিয়েছে, চিন্তাধারায় এসেছে প্রেমৈশ্বর্যময় জীবস্রষ্টার অপার করুণা, সাহিত্য-সংলাপে ভাষা পেয়েছে ঈশ্বরের করুণাঘন অবয়ব।

"এমনি হরির অহেতু করুণা —
প্রেমের এমনি যাদু,

কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয়
তস্করও হয় সাধু।"

সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করলে রামানন্দ, কবীর, নিম্বার্ক, তুকারাম, একনাথ, নানক প্রভৃতি সাধক সংস্কারকদের যুগচেতনার সন্ধান মেলে। প্রসঙ্গত এ কেবল ইতিহাসের কথা নয়, সমসাময়িক ইউরোপীয় ইতিহাসে লুথার, ক্যালভিন, জুইঙ্গলি, কোশেট, ইরেসমাস্‌ প্রভৃতি সাধক-সংস্কারক সন্ত-সেবকদের কথা ও কাহিনীতে উর্বর। ইতিহাসের সন্ধানী আলোকে সম্ভাবনাময় ভারতীয় ইতিহাসের চৈতন্যোত্তর যুগ পর্যালোচনা করলে একটি অভ্রান্ত অনস্বীকার্য নতুন অধ্যায়ের যোজনা দেখতে পাই, যাকে ভক্তিধর্মের প্রয়োগ সাফল্যের অকাট্য নিদর্শন হিসাবে তুলিত করা যায়।

Charles Binyon নামে একজন বিদেশী সমালোচক আকবরের (১৫৫৬—১৬০৫) কৃতিত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন **"If theological disputation and religions animosities are the marks of a high civilisation, they rivalled in fierceness those of European countries, but here was a monarch who actually believed in toleration."** ইতিহাসের কি বিস্ময়কর বিধান, ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে আকবরের রাজ্যাভিষেকের সমসাময়িক ঘটনা **Religious Peace of Augsburg**-এর শান্তি চুক্তি। এই শান্তি চুক্তিতে **Reformation** বা ধর্ম সংস্কারের সঞ্জাত **catholic protestant** অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান সূচিত হলেও বিষবাদের বীজ উচ্ছিন্ন হওয়া দূরে থাকুক সাম্প্রদায়িক জটিলতা বৃদ্ধি পেল। রাজার ধর্মপ্রচার ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হবে এই প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত তথাকথিত শান্তির স্থলে নতুন বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। উপ্ত হল আত্মনাশা, সর্বগ্রাসী ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের বীজ। ভারতবর্ষের ইতিহাস কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতার খাত ভ্রষ্ট হয়নি। ইতিহাসে কল্পনা বিলাসের স্থান নেই। তথাপি আলোচনা সূত্রে বলা যায় ঔরঙ্গজেব না হয়ে দারাশিকো সিংহাসন আরোহন করলে ভারতীয় জাতি ও সমাজতত্ত্বের ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে রচিত হতো। থাক সে কথা, আমাদের মূলপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। **Anthropocentric** চিন্তাধারার ফসল হিসেবে যা প্রণিধানযোগ্য তাহল **Monotheism** বা একেশ্বরবাদ আর **Humanism** বা মানবতাবাদ-এর সমন্বয়। একেশ্বরবাদের মূলগত কথা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। উপনিষদের কথায় "যঃ একঃ সবর্ণঃ বহুধাশক্তি যোগাৎ, বর্নাণ অনেকান্‌ নিহিতার্থ দধাতি, সঃ ন বুদ্ধ্যাশুভয়া সংযুনক্তু।" তাহলে দেখা গেল, একেশ্বরবাদ ধর্মনিরপেক্ষ, দ্বন্দ্ব নিরপেক্ষ। মানবতাবাদ তো সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক্ষ **secular culture**-এর পথিকৃৎ। এর মর্মমূলে আছে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ নীতিবোধ; সংযম, শালীনতা, প্রেম, পবিত্রতা, অহিংস সহাবস্থান, আত্মার অপ্রতিহত বিকাশ ও অনাবিল মুক্তি। এতে ব্রহ্মবাদীর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপাসনা, **Rationalist**-দের যুক্তি উপাসনা, **Materialist**-দের ভোগতৎপরতা, **Spiritualist**-দের অখণ্ড চেতনায় দেহাতীত ভাবসমাধি, সবকিছুর স্থান আছে। এমনি করে মতের দ্বন্দ্ব, পথের দ্বন্দ্ব, দলের দ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব — সকল দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি, প্রেমই যার পাথেয়, প্রীতিই যার সর্বস্ব, এ যেন — "অগ্নিহোত্রী মিলিছে হেথায়, ব্রহ্মাবিদের সাথে, বেদের জ্যোৎস্না মিশে-মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে"-র অখণ্ড-অবিভাজ্য ভারত প্রেমের স্থিতাধার। গীতার "অচ্ছেদ্যোয়ং, অদাহ্যোয়ং অক্লেদ্য-অশোষ্যোবচ, নিতঃ সর্বগতঃস্থানুরোচলয়ম্‌ সনাতনঃ।" ভারত আত্মার প্রাণ উর্বর উপলব্ধি।

শ্রীচৈতন্য অসামান্য মানবপ্রীতির রসে হারিয়ে সমাজ মানসকে নতুন আদর্শে গড়ে তুললেন। ক্রমে অন্তর্হিত হলো অতীত অন্ধ সংস্কার, মানুষ পেল মানবিক স্বীকৃতি। ভক্তিরসে আপ্লুত মানব হৃদয় তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেল। ভেদ ও বোধ বর্জিত পরমত সহিষ্ণুতা থেকে উদ্ভূত হলো সামাজিক

ঐক্যানুভূতি, দেশপ্রেম, স্বদেশানুরাগ। কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বৈষ্ণবকুল জাতিভেদ ভুলে এক নতুন সমাজবাদে দীক্ষিত হলো। ভারতীয় ইতিহাসের সন্ধিকালে এই শ্রেণী ও ধর্ম নিরপেক্ষ বিবর্তন ক্রমে "হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ জৈন পারসিক মুসলমান ও খৃস্টানীর" মিলন মঙ্গল রচনা করল। আকবর সম্পর্কে কথিত হয় **"He freed India from Arabicism and Indianised Islam."** শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে **"He cast religion in a new mould and then open the doors of faith to absorb and assimilate the down trodden multitudes to build the bulwark of freedom, peace and Progress"** মহাজাতিতত্ত্বের ইতিহাসে বর্ণাশ্রম-আশ্রিত সমাজের এ বিবর্তন চমকপ্রদ হলেও কল্পকথা নয়।

ভাব ও বিগ্রহ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভজনে-কীর্তনে অগনিত ভক্তজনের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, সত্যের সার। ইতিহাসে বিচারে শুদ্ধ-বুদ্ধ শাশ্বত ভাগবতী তনু। বিপ্লবের দিশারী, সমাজের কাণ্ডারী। গৌতম থেকে গান্ধি অবধি সংস্কারকদের কথা যেমন ইতিহাসের সম্পদ শ্রীচৈতন্য ও তেমনি ইতিহসের রসবিশারদ ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁকে ঘিরে যে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-বৈরাগ্য-আনন্দ মন ভাবালুতার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তা যদি উটকো আকস্মিকতার বহিরঙ্গ অভিব্যক্তি হতো তাহলে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চেতনার প্লাবন ভারতীয় তটরেখায় অপ্রতিহত তরঙ্গ ভেঙ্গে আছড়ে পড়তো না। ভগবান কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভক্তজনের জীবনাসক্তি যেমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তেমনি শ্রীচৈতন্য যে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন তাতো ঐতিহাসিক অসত্য নয়। সাম্প্রতিক ইতিহাসে বঙ্গ ভঙ্গ রোধের কথা যদি বিকৃত না হয়, তাহলে শ্রীচৈতন্য চালিত গণপ্রতিরোধই বা প্রক্ষিপ্ত ভাবালুতা বলে অবান্তর বিবেচিত হবে কেন?

ইতিহাসের পরিহাস, আজকের পরিণত বুদ্ধি সমাজ স্বেচ্ছায় হোক, পরেচ্ছায় হোক বিচ্ছিন্নতা-বাদের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে উদ্ধত অমানসিকতার অসংযত আগ্রহে স্বদেশ ও স্বজাতির মর্যাদা বিকিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। এর কারণ ইতিহাসের বিকৃত উপলব্ধি; অকারণ, অবারণ অসম্বৃত আত্মহনন স্পৃহা। আমাদের বর্তমান জনজীবন নানা সমস্যা প্রপীড়িত, জনকোলাহলে সামগ্রিক কল্যাণবোধ আচ্ছন্ন, জনস্বার্থে, ক্ষুদ্রব্যক্তি ও সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থে বিড়ম্বিত। তাই বলে কি বিচ্ছিন্নতাবাদ এর প্রকল্পিত প্রতিকার? এ যেন ছিন্নমস্তার স্বকীয় রুধিরপানে তৃষ্ণা অপনোদনের আত্মঘাতী প্রয়াস। স্বদেশ, স্বভূমি যদি কারো ব্যক্তি সম্পদ না হয়, তাহলে তার ভোগও বাসনায় সংহতি বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা একধরনের বিজাতীয় ভ্রান্তিবিলাস। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যচিৎ ধনম্," প্রভৃতি কালজয়ী আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করে আত্মপ্রতারণার অপপ্রয়াস বৃথা হলেও এসব অমৃতবাণীর আবেদন আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। আর কেবল আমাদের কেন সমগ্র জগতের ঐশী অনুভবের স্মারক। তাই সময় এসেছে ইতিহাসের পুনর্বিচারের। মহাপুরুষ প্রসঙ্গ আজ ইতিহাসে অবান্তর ব্যক্তি পূজা অথচ

"আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব ?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব ?
আছে নৈরঞ্জনা কোথা সে মুক্তি ?
আছে নবদ্বীপ কোথা সে ভক্তি ?

এই বলে আমাদের কাব্য সাহিত্যের আপশোষ। মুশকিল হলো আমাদের শিশু-কিশোর-যুব জনের পাঠক্রম থেকে এ ধরনের চিন্তাধারা বিসর্জিত না হলেও বিশর্ণ হয়েছে; কারণ এতে ক্ষীর-পনির তো দূরের কথা ডাল-ভাতেরও সংস্থান হয় না। কারো মতে আবার ঈদৃশ মনোবৃত্তি পরিকল্পিত

প্রতিক্রিয়াশীলতার দুলর্ক্ষণ। কিন্তু ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর শাসক। তার ক্ষমাহীন সত্যসম্পাদনে কালের সম্মার্জনী সতত তৎপর। তাই মনে হয় কোনো আপাত দর্শনে সমাজের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সত্য দর্শনই এর স্থায়ী প্রতিকার। আমরা যেন না ভুলি

"অধর্মে নৈবতে তাবৎ, ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্মান্ জয়তি, সমূলস্তু বিনশ্যতি ।।

চৈতন্যোত্তর যুগে একটি বিস্তীর্ণ সাহিত্য গড়ে উঠেছে যার প্রভাবে মানুষ এক প্রেমময় রসঘন আনন্দলোকের সন্ধান পেয়েছে। মানুষের ঠাকুরালি যে কত সহজে মানুষকে ভাববিহারী করে তুলতে পারে, তারই প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যের সার্বজনীন আবেদন। মানব প্রীতিরসে অভিসিঞ্চিত বলেই বৈষ্ণব দর্শনের আবেদন বিশ্বময়। এর মূলে অবশ্য মহাপ্রভুর চৌম্বক আকর্ষণ। রূপে-রসে স্বাদে-গন্ধে এই অনিন্দ্য সুন্দর নর নায়ক শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপী ঐশী প্রেরণার উৎস। আজ আমরা নানা ধরনের পদ-যাত্রার কথা শুনতে অভ্যস্ত। পদযাত্রার মৌল অভিপ্রায় প্রচার, যোগাযোগ, জাগরণ। সম্প্রতি Mass media-র যুগে পদযাত্রা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মাত্রাহীনতার উদ্দেশ্যে সঠিক হাতিয়ার হয়ে নানা বিরূপ সমালোচনার উদ্রেক করলেও পঞ্চদশ শতকে পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল পদব্রজ-নির্ভেজাল জনসংযোগ। শ্রীচৈতন্য পদব্রজে দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ পরিভ্রমণ করে ভক্তি ধর্মের সারবত্তা প্রচার করে সারা ভারতকে প্রেমের রাখীডোরে সুসংবদ্ধ করেন। তাঁহার চেতনাঘন দিব্যভাবনায় যাবতীয় আবিলতা পঙ্কিলতার অবসান সূচিত হয়। সাথী-সহযাত্রীদের নিয়ে শ্রীচৈতন্যর এই পথযাত্রা তীর্থ যাত্রারই সামিল। প্রার্থনা "করুণাঘন ধরণীতল, কর কলঙ্ক শূন্য"। বর্তমান প্রসঙ্গে আমি গৌতম বুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে দুস্তর কাল এই দুই মহাজীবনকে পৃথক করে রেখেছে। আসলে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উভয়েই হিন্দু ধর্ম সঞ্জাত। সংস্কার তাদের কৌনিকত্বের অপনোদন করেছে। আর এই সংস্কারের ধারাবাহিকতায় গৌতম অগ্রজ। পার্থক্য হলো গৌতম সংস্কারক, অশোক প্রচারক, আর শ্রীচৈতন্য একাধারে সাধক, সংস্কারক ও প্রচারক। বৌদ্ধবাদ হিন্দু ধর্মকে সংস্কৃত করে মহাজ্ঞান পথে হিন্দু ধর্মে অন্তর্লীন হয়। এই শোধনবাদী ভূমিকা বৌদ্ধ ধর্মকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিল। শ্রীচৈতন্যর মত ও পথ বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রথিত, গ্রথিত, চর্চিত ও মার্জিত করে মানব প্রেমের তরঙ্গে চারিদিক উদ্বেল করে তুললো। আজ আর ধর্মের তত্ত্ব গুহায় গুপ্ত নয় চিরন্তন মানবিক বিবেক। তাই পার্থিব ইতিহাসের স্থূল উপলব্ধিতে মহাপ্রভুর অমর জীবন উপস্থাপনের বিনীত প্রয়াস। আর প্রার্থনা—

"মনন নয় তব শরীর চির নব
বিরাজ বাণীরূপে, অমর দ্যুতিমান্।
তবু এ দেহ ধরি এসেছে অবতারী,
হিংসা নাগিনীরে করো হে হতমান্।
জগৎ ব্যথা ভরে, জাগিছে ডাকিছে জড়করে,
এ মহা কোজাগরে কে দিবে বরদান
এসো হে এসো শ্রেয়ঃ, এসোহে মৈত্রেয়.
ক্রূরতা মূঢ়তার, করো হে অবসান।"

রাস

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ

'রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো' ইত্যাদি শ্রীভা, ১০/৩৩/৩ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন — "রাসঃ পরমরস-কদম্বময় ইতি যৌগিকার্থ। — রাস-শব্দের যৌগিকার্থ হইতেছে এই যে, রাস পরমরস-কদম্বময়।" পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য যদি পরমরস কদম্বময় হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব রাস বলা হইবে। তাহা হইলে এই 'পরমরস-সমূহ'ই হইল রাসক্রীড়ার প্রাণবস্তু ; ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যমাত্রকেই রাস বলা যাইবে না।

পরমরস

কিন্তু 'পরমরস' কি ? পরমবস্তুর সহিত যে রসের সম্বন্ধ, তাহাই হইবে পরমরস। আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই পরমবস্তু ; সুতরাং তাঁহার সহিত, অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা স্বরূপের সহিত যে রসের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু বা তাঁহার প্রকাশসমূহ বা স্বরূপসমূহ হইতেছেন চিন্ময়বস্তু ; চিন্ময়বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার বা তাঁহার কোনও প্রকাশের সম্বন্ধ হইতে পারে না ; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সহিত সম্বন্ধান্বিত পরম-রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত ; তাহা জড় বা প্রাকৃত হইতে পারে না। সুতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই হইবে পরমরস।

এখন দেখিতে হইবে — যাহা সর্বতোভাবে পরমরস, তাহার অস্তিত্ব কোথায় ?

চিন্ময়রস কেবলমাত্র চিন্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে। পরব্যোমের রসও চিন্ময় ; সুতরাং জাতি-হিসাবে তাহাও পরমরস ; কিন্তু তাহা রস-হিসাবে পরমরস নয়। এই কথা বলিবার হেতু এই যে — পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও বৈকুণ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদনের অধিকারিনী হইয়াও, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালসান্বিতা হইয়া উৎকট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের রস অপেক্ষা রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের দিক দিয়া ব্রজরসের উৎকর্ষ আছে। পরম লোভনীয় ব্রজরসের পরম উৎস হইতেছে — মহাভাব ; কিন্তু এই মহাভাব দ্বারকামহিষীদিগের পক্ষেও একান্ত দুর্লভ। 'মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্লভ' — দ্বারকামহিষীদের সংশ্রবে যে রস উৎসারিত হয়, তাহা অপেক্ষা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সংশ্রবে উৎসারিত রসের পরম উৎকর্ষ। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয় ; এই প্রেম যত গাঢ় হইবে, রসত্ব ততই গাঢ় হইবে, ততই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় হইবে এবং সেই রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও ততই অধিক হইবে। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে প্রেমের যে স্তর, বিকশিত, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথাতো দূরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও তাহা পরম দুর্লভ ; সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবাখ্য প্রেমই গাঢ়তম ; এই প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন তাহাও হইবে পরম আস্বাদ্যতম এবং তাহার আস্বাদনে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও হইবে সর্বাতিশায়িনী, 'ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাম'— ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে স্বীয় চির-ঋণিত্ব — অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধত্ব-স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং রস হিসাবে — আস্বাদন-চমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তিত্বে — ব্রজের কান্তারসই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ — সুতরাং পরমরস। আবার ইহা চিন্ময় (চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ) বলিয়া জাতি-হিসাবেও ইহা পরমরস। জাতি হিসাবে এবং রস-হিসাবেও পরমরস বলিয়া ব্রজের কান্তারস বা মধুরসই হইল সর্বোতোভাবে পরমরস।

সাধারণত কান্তারসই পরমরস হইলেও তাহার পরম-রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের সর্বাতিশায়ী বিকাশ কিন্তু কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমে। শ্রীরাধাতে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, তাহাতেই প্রেমের সমস্ত গুণের, স্বাদবৈচিত্রীর এবং প্রভাবের সর্বাতিশায়ী বিকাশ। এই স্তরের নাম মাদন। মাদনই প্রেমের সর্বোচ্চতম স্তর, মাদনই স্বয়ং প্রেম; প্রেমের অন্যান্য স্তর এইং বৈচিত্রী মাদনেরই অংশ, মাদন হইতেছে সকলের অংশী। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, স্বয়ং প্রেম-মাদনেও প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী অবস্থিত। তাই মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয় তখন প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব-গুণ-স্বাদাদির সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে; তাই মাদনকেই বলে সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী প্রেম; ইহা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোন ব্রজসুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই।

'সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপর।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা' ॥

... এই পরম-রসকদম্বময় লীলারসের মূল উৎস হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে, অন্য শতকোটী গোপী থাকিলেও, উল্লিখিতরূপে 'পরম-রসকদম্বময়' রস উল্লসিত হইতে পারেনা। তাই বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শতকোটী গোপীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শতকোটী গোপীর সঙ্গেও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্তির প্রভাবে 'শতকোটীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতেন, তাহা রাস নৃত্য হইতে বটে; কিন্তু তাহা পরমকদম্বময় রাস হইত না। এই জন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয় — রাসলীলার ঈশ্বরী প্রাণবস্তু হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম-রসকদম্বময়ী রাসলীলার অনুষ্ঠান করিতে পারেন না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম রসকদম্বের উৎস নহেন, অন্য কোনও গোপীও নহেন। তাই শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপী যেমন রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাসী মাত্র — শ্রীরাধা যখন পরম রস-কদম্বময় রাসরসের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বন্যায় উম্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া বিহার করিতে পারেন, এই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা অন্য কোনও ধামে নাই বলিয়াই ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে রাসলীলা নাই, থাকিতেও পারে না। .. আসলে বহু নর্তক এবং বহু নর্তকীর যে মণ্ডলী বন্ধন নৃত্যেতে উল্লিখিতরূপ পরমরসসমূহ উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাই রাস। .. লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনেকলীলা আছে; প্রত্যেক লীলাই তাঁহার মনোহারিনী; কিন্ত রাসলীলার মনোহারিত্ব এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার চিত্তের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া যায়, তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

'সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥

রাসলীলার ন্যায় অন্য কোনও লীলাই শ্রীকৃষ্ণের এত মনোহারিনী নহে। তাই রাসলীলা হইতেছে সর্বলীলা-মুকুটমণি।

ব্রজলীলার সংক্ষিপ্ত ধারাপ্রবাহ

ডক্টর শিবচন্দ্র লাহিড়ী

প্রাক্ চৈতন্যকালে ব্রজলীলা সম্বন্ধে লোকায়ত ধারণা শরীরী আবেদনের ঊর্ধ্বে উঁচু সুরে বাঁধা ছিল না। গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'-তে উধৃত বাংলাদেশে লেখা এই অবহট্‌ঠ কবিতাটির মধ্যে রাধা-কৃষ্ণলীলার লোকমানসসম্ভব প্রেম সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে—

রাই দোহড়ী পঢ়ণ সুণি হসিউ কণহ গোআল।
বৃন্দাবনঘণকুঞ্জঘর চলিউ কমণ রসলে।

[রাধার ছড়া আবৃত্তি শুনে কৃষ্ণ গোপাল হাসল এবং রসলে পদক্ষেপে বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে চলল।]

প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি কবিতায় কৃষ্ণের নৌকাবিলাস কাহিনীর লোকায়ত প্রেম-চর্চার চপল চিত্র রয়েছে—

—অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগ্যাই ণ দেহি।
তুঙ্গ এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি ॥

ওরে রে কৃষ্ণ, (তুমি) নৌকা বাইবে। ডগমগ (নৌকার টলমলানি) ছেড়ে দাও, (আমাদের দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করে দিয়ে যা চাও তাই নাও।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাস লোকজীবনে সম্ভোগরসের এই আস্বাদ সম্প্রসারিত করেছেন কয়েকটি খণ্ড জুড়ে। চৈতন্যকালে ব্রজলীলার তত্ত্বগত ঊর্ধ্বায়ণ হলেও সাধনায়, সেবা প্রজ্ঞায়, কাহিনী ও পদাবলীর লীলারূপ চিত্রণে পুনরায় সেই আদি রসাত্মক সম্ভোগ ক্রমে অবারিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দের কবিওয়ালা কৃষ্ণ ও রাধা নামের যে দু'জন প্রেমিক ও প্রেমিকা নির্বাচন ক'রে সখীসংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন, বিরহ ইত্যাদির গান বাঁধলেন, সেখানে 'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী-শক্তিঃ'-র কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন (কবি সঙ্গীত, লোকসাহিত্য), 'ইংরেজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজ-সভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।'

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্রজপ্রেম 'সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি'-র সভার প্রমোদগান হিসাবে মূল্যাঙ্কিত হল —

এসো নূতন প্রেম করি, প্রাণে বাঁধা রেখে প্রাণ।
রাখবো হৃদয় মন্দিরে বেঁধে প্রেমডোরে,
প্রেমের প্রহরী থাকবে আমার দু'নয়ান ॥

যাতে মন দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই,
যেন কেউ কারে হানতে নারে বিচ্ছেদ বাণ ।।'

ব্রজপ্রেমে শ্রীরাধার বিরহ অষ্টাদশ শতাব্দের ভাবপাত্রে প্রতারণার স্মৃতিরূপে সংগৃহীত। একালের 'নূতন প্রেম'-এর নতুন নায়ক-নায়িকা যথেষ্ট সতর্ক। 'হাতে রেখে হাতে যাই, যেন কেউ কারে হানতে নারে বিচ্ছেদ বাণ।' এমন হাতে রেখে প্রেম করার গানই কবির গান। কবিওয়ালার দৃষ্টিতে প্রেমের আদর্শ ও মূল্যের সূচক একটি গান —

দেশ চলালেম প্রেম করে সই,
প্রাণ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে
আমি দুই জ্বালাতে জ্বলতেছি ।।

বিরহিণী নায়িকার কাতর আর্তি এখানে নেই, পরিবর্তে জীবন সম্বন্ধে ছদ্ম বিতৃষ্ণার নাগরালি স্পষ্ট। প্রেম যে জীবনের একটা বৃত্তিমাত্র ('দেশ চলালেম প্রেম করে'), অনন্য হৃদয়াদর্শ নয়, কবিওয়ালার প্রেমিকা আক্ষেপের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। আর একটি গান উদ্ধৃত করি—

কও দেখি সখি রাধারে কেন,
মা রাধা কেউ বলে না।
শ্রীমতী বটে সজনি, প্রকৃতি রূপে প্রধানা ।।
যদি ভাবি মনে মা বলি বদনে,
জড় হয় তার রসনা।

রাধা চিরন্তনী নায়িকা, তার সম্পর্কে মাতৃত্ব-কল্পনা ব্রজপ্রেমের রোমান্টিক অনুষঙ্গ ধ্বংস ক'রে উৎকট রসাভাস সৃষ্টি করবে, এ ধারণা বৈষ্ণব কবিদের অবশ্যই ছিল। প্রসঙ্গভ্রষ্ট হবার ভয়ে কোনদিনই নায়িকা সম্বন্ধ অসঙ্গত প্রশ্নের কৌতূহল বৈষ্ণব কবি মনে রাখেন নি। কিন্তু বাচাল কবিওয়ালার সে সংযম নেই। তিনি সরাসরি সখিকে প্রশ্ন করে বসেছেন, কোন সদুত্তর মেলেনি, তবু নায়িকার এই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনাটিকে আসরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা না করলে যেন রসোপভোগ পরিপূর্ণ হচ্ছিল না। মুক্তকণ্ঠে কবিয়াল- যেখানে কুৎসা-কলঙ্কের বিষয়কে সুরে তালে ছন্দে রসানুকূল ক'রে তোলে, সেখানে রা ার মাতৃত্বের প্রশ্ন অনুক্ত রাখাই অসঙ্গত হত।

কবিওয়ালার গানের পাত্রপাত্রী তিনজন। নায়ক, নায়িকা এবং দূতী। বর্ণনীয় বিষয় দুটি, কলঙ্ক ও ছলনা। পরকীয়া প্রেম সযত্নে গোপনীয়, তাতেই তার পবিত্রতা-রক্ষা, বৈষ্ণব কাব্য এ কথার প্রমাণ। কবিগানে নায়ক নায়িকা অথবা দূতীর প্রগল্‌ভতায় প্রেমের সে সৌন্দর্য ও গভীরতা অনেক কমে গেছে। যে দুটি নারী-পুরুষ নিয়ে এই প্রেমের বয়ান, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে কবিওয়ালের ধারণা —

নারী : নলিনী তপনে তেজিয়ে বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয়।
পুরুষ : কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে পতি তার দিবাকর, জেনেও ত মধুকর ভুলেও ত্যজে না পদ্মেরে।

দুটি ব্যভিচারী মন নিয়ে এ প্রেমের পট বয়ন করেছেন কবি। শিল্পের সঙ্গে ভক্তির মিলন ঘটেছিল বলেই বৈষ্ণবীয় প্রণয় লোকায়ত স্থূলতার স্পর্শ থেকে মুক্ত। পণ্য নয়, মহৎ হৃদয় প্রেরণারূপে এ প্রেম জীবনের নিভৃত সঙ্কল্পের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। কবিওয়ালার গানে বৈষ্ণবের আদর্শ প্রেরণা নেই। ব্রজপ্রেমের সুলভ সংস্করণের মত কবির গান ভাবের বাতাসকে কেবল দূষিতই করেছে। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় দুর্বলতার যেটুকু আভাস ছিল তারই প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন, অষ্টাদশ শতাব্দের রুচিশীলিত প্রকাশ দেখি কবিওয়ালার কলমে।

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। — বলেছিলেন ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দের কবিকণ্ঠে এ বিপ্লবের বাণী বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রথম উচ্চারিত। মানুষের আবাস পুড়লে দেবতার আবাসও পুড়বে। মধ্যযুগের ভক্তিপ্রণত কাব্যধারায় এই প্রথম উজানের টান। তাঁর অন্নপূর্ণামঙ্গলে 'ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে' ইত্যাদি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদটিতে কবিমনের অস্মিতা-প্রকাশের পথ প্রথম খুলে গেল — 'নিত্য তুমি খেল যাহা। নিত্য ভাল নহে তাহা। আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে। তুমি যে চাহনি চাও। সে চাহনি কোথা পাও। ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে।' দেবতার গ্রাস থেকে মানুষের মুক্তির প্রভাতকল্পা শর্বরী। সে প্রভাত দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দে। বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালার গান — বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেবতার বেদিমণ্ডপ অথবা রাজার সভামণ্ডপে গাওয়া পুরনো গানগুলি ভাব ও রূপাদর্শের কঠিন বিচার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বীকৃত হত। দেবতার নৈবেদ্য সাজাতে নিষ্ঠার প্রয়োজন। সূক্ষ্মরুচি রাজা অমাত্যের মনোরঞ্জন করতে উচ্চাঙ্গ শিল্পশক্তি প্রমাণের দায় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে দেবমণ্ডপ অথবা সভামণ্ডপের আশ্রয় ভরসা কবিচিত্তে ছিল না। নিষ্ঠা এবং কলাসংযমের প্রয়োজন ফুরোলে স্বৈররুচির প্রেক্ষাপটে মনের অনুচার্য প্রণয়বেদনা আত্মপ্রকাশ করল। প্রেমের বিচিত্র রস-রহস্য দীক্ষিত চিত্তের অনুভব — ভূমি ত্যাগ করে মুচি ময়রা বৈরাগী বণিক ফিরিঙ্গি পাটুনীর কামনা-কল্পনা আশ্রয় করল। প্রেমের সুলভ নিদর্শন প্রত্যাশায় কবিরা ব্রজের পরকীয়া প্রেম-কথাকে রচনার বিষয়বস্তু করে নিলেন। স্বর্গের মন্দাকিনী মর্ত্যের মাটিতে পাবনী ধারারূপে দেখা দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাকেও অবতরণের অধঃপতন মানতে হয়েছিল মধ্যপথে। প্রবাহের উৎসমুখে প্রথম উচ্ছ্বাসের আবিলতা থাকেই। কবিগান সেই মর্ত্যমুখী হৃদয়োচ্ছ্বাসের উৎসমুখে জীবনের আবিলতা সৃষ্টি করেছিল। তবু ব্রজপ্রেমের কমণ্ডলুধারায় শেষ পর্যন্ত মানব প্রেমের কলস ভরে উঠেছিল আরও পরের কালে — মধুসূদনের, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য পরস্পরকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই প্রভাব কেবল বহিরঙ্গগত এবং বিচ্ছিন্নমাত্র — একের প্রভাব অন্যের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ, ইহাদের পরস্পরের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। তবে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যতদিন আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দেয় নাই, ততদিন পর্যন্তই পরস্পরের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার আদর্শ যখন শিথিল হইয়া আসিল, তখন ইহার উপর বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব দুর্জয় হইয়া উঠিল। অতএব কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের আদর্শগত অধঃপতনের যুগের নিদর্শন দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হয় না যে, 'এই দুইটি কাব্যধারার অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা বহুলাংশে অভিন্ন'। মঙ্গলকাব্যের ভক্তি ও বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শের ভক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। দ্রোহ বুদ্ধি এবং অবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র, কখনও সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শজাত ভক্তি অহেতুকী ভক্তি, কোনও বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইহার জন্ম হয় না, সেইজন্য ইহা যেমন পবিত্র নির্মল, তেমনই চিরস্থায়ী। অতএব বৈষ্ণব সাহিত্যের বহিরঙ্গগত কোনও প্রভাব মঙ্গলকাব্যের উপর কার্যকর হইলেও, ইহাদের অন্তর্নিহিত ভক্তির অনুভূতিতে ইহারা পরস্পর সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবে রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন 'সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থাবলম্বনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাব-প্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অবস্থায় সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।' অতএব ইহাদের 'অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা'-তে যে সুদূর পার্থক্য থাকিবে তাহাও নিতান্তই স্বাভাবিক।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মানবতার জয়গানে মুখর 'কৃষ্ণলীলার একান্ত আধ্যাত্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াও বৈষ্ণব কবিগণ পরোক্ষে মানবতারই জয়গান গাহিয়াছেন'; খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অজয়ের তীরে বাংলার আদি কবির কণ্ঠে যে সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী প্রায় পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে অনুরণিত হইয়াছে। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে' যে বৈষ্ণবের গান নয়, তাহা বাঙ্গালী কবি অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যে এই মানবিকতার অনুভূতি আরও প্রত্যক্ষ। বৈষ্ণব কবিতায় দেবতাকে বাদ দিয়া মানুষ নহে বরং এই দুই-ই সেখানে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাহাতে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই — তাহার একটি বিশেষ অংশ শুধু সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে প্রতিটি মানুষ পূর্ণাঙ্গ, তাহার দেহের মালিন্য পর্যন্ত তাহাতে প্রত্যক্ষ। শুধু তাহাই নহে, এই মলিনতা লইয়া মানুষ সেখানে তথাকথিত দেবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মানুষই লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় দেবতা লক্ষ্য, মানুষ উপলক্ষ্য। সার্বজনীন মানবতার ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্যের কাব্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের উত্তরাধিকার ও বাঙলায় গৌণ লোকধর্মের উদ্ভব

ডক্টর সনৎকুমার মিত্র

সাধারণভাবে সমগ্র বাংলাদেশে জৈন-বৌদ্ধ ও বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত একদিন পোষণ করে এলেও সাম্প্রতিক ইতিহাস মোটামুটি ভাবে স্বীকার করে যে, গুপ্তযুগের পূর্বে বাঙলায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার বিষয়ে তেমন কোনো নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় না। অতএব প্রাক গুপ্তযুগে অবৈদিক ব্রাত্যধর্ম এবং অনৃ-আর্য জীবনাচরণ এই দুই ছিলো এদেশের আদি সংস্কৃতি। এবং এর পরের অবস্থা এই যে : 'প্রাক-গুপ্ত পর্বে বাঙলার জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অল্প বিস্তর প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্য-বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সংহিতায় বাঙলাদেশের তো কোনো উল্লেখই নেই, ঐতরেয় আরণ্যক-গ্রন্থে যদি বা আছে (?) তাহাও নিন্দাচ্ছলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাঙলাদেশ আর্য-বৈদিক সংস্কৃতির বহির্ভূত'।[১]

পরবর্তীকালে গুপ্ত শাসনের স্বর্ণযুগ অতিক্রম করে সুবে বাঙলার ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণায়, দুই দফার পাল রাজত্বে (আনুমানিক ৭৫০-১১৬২ খ্রীস্টাব্দ) এলো বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়। তারপরে বর্ম এবং সেন রাজবংশের শাসনকালে সমগ্র বাঙলায় আবার ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্মের প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হলো। এর সঙ্গে আদি লোক-ধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাবতো রয়েইছে। পরবর্তী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসেছে মুসলমান শাসনাধিকার। এই নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে আগত সম্পূর্ণ নতুন ধর্মমতের সংঘাত বা বোঝাপড়ায় বাঙলার পরবর্তী বছরগুলি নানাভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ফলে, সমগ্র দেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ক্রমান্বয় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর প্রধানতম কারণ হলো, আজ নয় সেই সু-অতীত ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্বকাল থেকেই উচ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক নিপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানবিক লাঞ্ছনায় পিষ্ট হচ্ছিল যে অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু তাদের কাছে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে এই নবাগত ইসলাম ধর্ম নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, আচার-সর্বস্বতা, আত্মপরতন্ত্রতার চূড়ান্ত, সমগ্র জনগোষ্ঠীর সামনেই কোন আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি তুলে ধরতে বা জাগতিক অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে নি। শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম এবং প্রবলশক্তি মুসলমান ধর্ম এবং শাসকের সামনে হীনবল হয়ে পড়েছে। সমস্ত মুসলমান শাসকই পর-ধর্মমত সম্পর্কে উদার ও প্রজাপালক ছিলেন এমনও ভাববার কোন কারণ নেই।[২] বরং সুযোগ পেলেই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার ওপর তাঁদের অনেকেই আক্রমণ করেছেন হিন্দু-মন্দিরাদিও ধ্বংস করেছেন। অপরপক্ষে নিজেদের দুর্বলতায় ও ভেদবুদ্ধিতে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মমতগুলি ছিলো ক্ষত-বিক্ষত। বীরাচারী পশ্বাচারী প্রভৃতি-তান্ত্রিক উন্মত্ততায় সমগ্র বাংলাদেশের সমাজ-মানস মুসলমান আক্রমণের কিছুকালের মধ্যেই খণ্ড বিচ্ছিন্ন এবং ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছিলো। ঠিক এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে নবদ্বীপচন্দ্র, জগন্নাথ-শচী-মাতার নয়নের নিধি বিশ্বম্ভর বা নিমাই (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁর জীবনমুখী বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সেদিনের হিন্দু-সমাজের চেহারাটা দেখতে পান। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের ও অত্যাচারের ফলে হিন্দু ধর্মভিত্তিক সমাজের নীচের ভিতটা কি ভাবে যে ধ্বসে পড়েছিলো তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই খুব সরলভাবে এবং সহজভাষায় হিন্দু ধর্মের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তিনি বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ক্রিয়াকে উপস্থিত করলেন। অগণিত দরিদ্র মানুষের অপমানিত ও নির্যাতিত মনুষ্যত্বকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সকলকেই নিজের ভাই, আত্মার আত্মীয় বলে আহ্বান করলেন।[৩] কেবল একবার 'কৃষ্ণনাম কর', 'মুখে শুধু একবার হরিবোল বল' — তা হলেই তোমার সব পাপের ক্ষয়, তোমার আত্মার মুক্তি, ধর্মাচারণের এই সাধারণীকরণের সরল পদ্ধতিতে আপামর জনসাধারণ বিশেষভাবে অভিভূত হলো, অন্ত্যজ শ্রেণী, সমাজের নিচুতলার মানুষেরা তাঁদের মানবীয় মূল্যবোধকে

সম্মানিত হতে দেখে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানেরাও এই আহ্বান থেকে দূরে থাকতে পারলেন না।[৪]

এমন একটি বৈপ্লবিক ঘটনার পটভূমিকাকে ঐতিহাসিকগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিছু দীর্ঘ হলেও তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে করি। সেখানে দেখতে পাচ্ছি ঃ "তিনি (চৈতন্যদেব) নিজে এবং নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে লইয়া নদীয়ার পথ হরিনামে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেন। চিরকাল যেমন তখনও তেমনি ধনীরা ক্ষমতালুব্ধ, দরিদ্ররা অসহায় এবং সমাজের উঁচু-নিচু স্তরের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য লইয়া দুস্তর ব্যবধান। তাহার উপর দুইটি অতিরিক্ত সমস্যা ছিল। (এক) গৌড়ের-দরবারের প্রভাবে বিদেশী চাল-চলনের প্রসার। (দুই) তাহার প্রতিবিধানার্থে ব্রাহ্মণদের শুচিতা গণ্ডীর ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতা ও কঠোরতা। স্মৃতি-শাসনে তখন বাঙালী জাতি প্রায় দ্বিধা বিভক্ত হইবার যো হইয়াছিল। চৈতন্য নিষ্ঠাবান ঘরের ছেলে, দরিদ্র সন্তান ছিলেন না। এবং ধনী প্রতিবেশীদের ও ভক্তের ঘরে তাঁহার সমাদর ছিলো। তবুও তাঁহার মনের টান ছিল দীনের দিকে। অদ্বৈতের ঘরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনঘৃতাক্ত ভাত খাইয়া তাঁহার যেমন তৃপ্তি হইত, তেমনি হইত খোলাবেচা শ্রীধরের ফুটো লৌহপাত্রে জলপান করিয়া। কোন ভক্তকে তিনি ধনী করেন নাই, বরং রঘুনাথ দাসের মতো প্রচণ্ড বড় লোকের ছেলেকে তিনি দরিদ্রতম জীবনে অনায়াসে নামাইয়া দিয়াছিলেন। মানুষ নিজেকে হীন, গরীব, দুঃখী, দুর্গত বলিয়া খাটো করিবে এ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি 'দুঃখী', 'গুয়ে', ইত্যাদি নিকৃষ্টতাসূচক ব্যক্তি নামও তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিত। শ্রীবাসের বাড়ীতে 'দুঃখী' নামে এক চাকরাণী খাটিত। চৈতন্য তাহার নাম বদলাইয়া রাখিয়াছিলেন 'সুখী'। সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে তিনি একবার অতিথি হইয়াছিলেন। তাহার তিন বছরের ছেলের নাম 'গুহিয়া' শুনিয়া তিনি বদলাইয়া 'জয়ানন্দ' রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে সব মানুষ সব জীব সর্বদা সমান, যেহেতু সকলের প্রাণেই কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণ জগতের পিতা, সকল জীব তাঁহার পুত্র, অংশাধিকারী। তাই তিনি বলিতেন,

'জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ,
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।'

চৈতন্য বলিতেন, মনে ভালো-মন্দ কোন মতলব ইহলোক-পরলোক-ঘটিত কোন বাসনা না রাখিয়া হরিনাম কর। তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করিবেন। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে শান্তি জাগিবে এবং তখন ভিতরের বাহিরের কোন বন্ধনই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ধর্মের নামে আচার-বিচারের নিষ্ঠা এবং পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা মানুষের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ আনে, সমাজকে খোঁয়াড়ে পরিণত করে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধায়। চৈতন্যদেব সব মানুষকে যে খোলা হাওয়ার চলা পথে ডাক দিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র একসঙ্গে জুটিতে সংকোচ বোধ করে নাই। চৈতন্যের দেহাকৃতি ও লাবণ্যময় স্নিগ্ধ ভক্তিভাব দেখলেই লোকে আকৃষ্ট হইত।[৫] এতে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেমভক্তিময় ধর্মভাবে নতুন করে জেগে উঠলো। বাঙালীর চিন্তা ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন এক যুগান্তকারী তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এলো। এই প্রেমভাব, এই 'মানবিকবাদ কেবল নদে শান্তিপুর বঙ্গদেশকেই নয়, প্রায় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে পরিপ্লাবিত করে দিল সেদিন তাই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ছিলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সেদিনের বাঙলায় ইসলামের দ্রুত সম্প্রসারণের মুখে 'চৈতন্য-আন্দোলন' ইসলামের প্রসারকে স্তম্ভিত করে প্রায় রুদ্ধই করে দিয়েছিলো বলা বলে। কেন না, ইসলামের যেসব বৈশিষ্ট্য নিপীড়িত অবজ্ঞাত জনগণকে আকৃষ্ট করেছিলো, তাদের সবগুলোই চৈতন্য মতবাদে গৃহীত হয়েছিলো। যেমন, মানুষে মানুষে সমতা, মিত্রতা ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার, মানুষের স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের অধিকার, বর্ণভেদে জাতিভেদে

কিংবা সম্পদভেদের মানুষের মর্যাদার তারতম্যের অস্বীকৃতি, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের মূলসূত্র রূপে প্রীতির স্বীকৃতি, অসবর্ণ বিবাহ ও তালাক, নামকীর্তন, বিষয়ে অনাসক্তি, কৃষ্ণে সমর্পিত জীবন ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা যে দেব-দ্বিজ-বেদের দোহাই পেড়ে বর্ণভেদের বৃত্তিভেদের ও অধিকার ভেদের প্রাচীরে বন্দী রাখা হয়েছিলো কোটি কোটি নব-নারায়ণ মানুষকে, তার থেকে মুক্তিদান — মানবতার বিকাশের অসীম দিগন্তের সন্ধান দান। কাজেই নির্জিত হিন্দুর ইসলামে প্রয়োজন ফুরাল। ...

'তাই চৈতন্য মতবাদ বাঙলার অধিকাংশ হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যক্ষে গ্রহণ না করলেও মনে-মেজাজে বরণ করেছিলো — আকণ্ঠ পান করেছিলো প্রেমসুধা। স-প্রেমবাদ মানুষকে ও মানবিক মহিমাকে দিয়েছিল স্বীকৃতি। সবার জন্য অঙ্গীকার করেছিলো প্রীতি।'[৬]

কিন্তু এমনভাবে বহুদিন গেল না। কারণ চৈতন্যদেবের নাম — মুখ্য সহজ আচরণীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রাথমিক জোয়ার স্বাভাবিক কারণেই ধীরে ধীরে নানা আচার, সাধনা ও রীতি-নীতির বন্ধনে বাঁধা পড়লো। সাধের কৃষ্ণনাম উচ্চারণ সাধ্যের বৈষ্ণব ধর্মাচরণের দ্বারা রীতিনির্দিষ্ট (codified) হলো। চৈতন্যদেব জাতিভেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সমাজের অন্ত্যজ-শ্রেণীকে তুলে ধরার যে চেষ্টা করেছিলেন, তা একশ বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি। এমনকি বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের অন্যতম গোপাল ভট্ট মনে করতেন যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণজাতীয়দের শিষ্য করতে বা দীক্ষা দিতে পারবেন, যতবড় বৈষ্ণব সাধক হোন না কেন এ-বিষয়ে অব্রাহ্মণ কেউ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান করতে পারবে না।[৭]

অপরপক্ষে চৈতন্য-প্রবর্তিত সাম্য-বোধকে ধীরে ধীরে অবদমিত করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাঁদের ভেদবুদ্ধি নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন।[৮] শাক্তরা তান্ত্রিক আচার সর্বস্বতার উগ্রতাকে সদ্য-গত বৈষ্ণবীয় পেলবতার দ্বারা পরিশোধিত করে নিয়ে বহু ক্ষেত্রেই নতুন রূপে প্রকাশ করতে লাগলেন, যার প্রত্যক্ষ ফল রামপ্রসাদ। অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্মনেতার অভাবে আস্তে আস্তে শিথিলতা, অনাচার, চ্যুতি দেখা যেতে লাগল।

এই সমাজ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উক্ত সর্বপ্রকার অভিঘাতের ফলে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হলো গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, শাক্ত এবং তৎ-অনুগামী ধর্ম সম্প্রদায়ীগণের পক্ষে। কারণ, চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত প্রভাবে ও তাঁর সরল এবং আন্তরিক মানব-প্রেমধর্মের প্রভাবে, জেগে ওঠা সমস্ত স্তরের মানুষের দ্বারা আপাত হীন-শক্তি উক্ত প্রবল শক্তি-ধর ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি কিছুকাল দুর্বল হয়ে থাকার পর, যেই বৈষ্ণব ধর্মের দুর্বলতার সুযোগ পেল, অমনি বিপুলবেগে আত্মপ্রকাশ করলো, ভেদবুদ্ধি ও তজ্জাত অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। এর ফল কি হলো? ফল হলো এই যে চৈতন্যদেবের নাম ও প্রেমধর্মের দ্বারা মানবতা ও মনুষত্বের যে উদ্বোধন নিচুতলার মানুষগুলোর মধ্যে ঘটেছিলো, যাঁরা নিজেদের মানুষ বলে চিনতে শিখেছিলেন, তাঁরাই ঐ চৈতন্য-বিতরিত মানব-প্রেমের প্রভাবে প্রাপ্ত আত্মবিশ্বাসে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের শরীয়তি শাসনের কট্টরতার মধ্যে ফিরে যেতে চাইলেন না, তেমনি অন্যপক্ষে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য শাসনের সেবাদাসত্ব গ্রহণেও আর রাজী হলেন না। তাঁরা চৈতন্য-ধর্মের সহজভাব ভাবা ও আন্তরিকতাকে — যা দিয়ে নিজেদের প্রাণের ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছিলেন — তাই দিয়েই নিজেদের সমাজের মতো করে, নিজেদের বুদ্ধিমতো ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন নতুন ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। অর্থাৎ সমালোচকের দৃষ্টিতে ঘটনাটি এই রকম : "শ্রীচৈতন্যের প্রাণবান সত্য ধর্ম মানুষের মনকে জাগিয়ে দিয়েছিলো। সে মনকে আর একবারে ঘুম পাড়ানো গেলো না। ভক্তিরসের প্রশস্ত নদীর মুখে বাঁধ পড়লো, জল ছাড়া হতে লাগলো কাটা খালে। কিন্তু এই বাহ্য সহজ রসধারা অবিচ্ছেদে বইতে লাগল তলে তলে সমাজ বহির্ভূত অনাচার লাঞ্ছিত সুদরিদ্র সাধক-

গোষ্ঠীই চিত্তক্ষেত্রকে সরস উর্বর করে দিয়ে। আউল-বাউল-দরবেশ সাঁই নামাঙ্কিত এই 'সহজ'-সাধক গোষ্ঠীই চৈতন্য সাধনার স্বাভাবিক অধর-সাধক।"[৯] এই অধর-সাধকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই আউল-বাউল-ন্যাড়া সহজিয়া-কর্তাভজা, হজরতি, বড়ি, অতি-বড়ি সাহেবধনী, বলাহাড়ী, হরিবোলা, নেমো বৈষ্ণবী ইত্যাদি অঙ্গুলি অপরিমেয় অসংখ্য সম্প্রদায়-উপ-সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় জন্মগ্রহণ করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের অপ্রকট হওয়ার শতাধিক বৎসর পরেই বাঙলায় যে পরিবর্তিত সমাজ-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে জাত ঐ সব ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু না কিছু মিল আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্বীকার করে থাকি যে উক্ত অসংখ্য ধর্মগোষ্ঠীর সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবচিন্তার off-shoot। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের প্রবর্তকের সঙ্গে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে একটা যোগাযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মনোভাব এই রকম যে তাঁরা যে ধর্মপ্রচার করেছেন তা-কোন ভুঁই-ফোঁড় ধর্ম নয়, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে, এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁরা কোন না কোনভাবে তাঁদের ধর্ম ও আদি প্রচারকের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সংযোগ দেখাতে চেয়ে থাকেন।

চৈতন্য-চিন্তা ও চেতনার ঋকৃথ গ্রহণকারী দুটি উল্লেখযোগ্য গৌণ-লোকধর্ম সম্প্রদায় নিজেদের এইভাবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ঃ

প্রথমত ঃ কর্তাভজা সম্প্রদায় ঃ 'শতাধিক বৎসরের মধ্যে উহা (বৈষ্ণবধর্ম) নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীকার না করিলেও বর্তমানের কর্তাভজন পদ্ধতি যে চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাধর্মের অন্যতম শাখা তাহা আজকাল অনেককেই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ..... চৈতন্যদেব নীলাচলে সহসা আত্মগোপন করিবার ১৬১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১০১ সালে আমরা আউলচাঁদের আবির্ভাব দেখিতে পাই। অনেকের ধারণা এই ফকির আউলচাঁদই নদীয়ার সেই গোরাচাঁদ — রূপান্তর ধরিয়া ধরায় নবধর্ম প্রবর্তন করিতে উদয় হইয়াছিলেন।'[১০]

দ্বিতীয়ত ঃ বাউল সম্প্রদায় ঃ 'হিন্দুজাতির বাউল সাধকদের মধ্যে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় ধর্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ...... বাউলেরা মনে করে যে চৈতন্যদেব এই ধর্মের মহাগুরু। তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই ধর্মের তত্ত্বপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। . মুসলমান কবিদের মধ্যেও এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ...... চৈতন্যদেবকে তাহারা 'মহাগুরু' বলিয়া গ্রহণ করে।'[১১]

অতএব সমাজ — ঐতিহাসিক নিয়মের সূত্রেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত মানবধর্মই পরবর্তী কালের অসংখ্য জানা-অজানা লোকধর্মের সৃষ্টিকে সম্ভব করেছে।

॥ পদটীকা ॥

[১] "..হিন্দু হইলেই ভালো হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। অথবা মুসলমান হইলেই ভালো হয় না, হিন্দু হইলেই খারাপ হয় না। উভয়ের মধ্যেই ভালো-মন্দ আছে। বরং একথা বলা যায় মুসলমানগণ যখন বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুগণকে শাসন করিয়াছে তখন সাধারণভাবে রাজকীয় গুণে মুসলমান রাজা হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহার।

[৩] 'Thus Vaishnavism has proved the saviour of the poor; it has proclaimed the dignity of every man as possessing himself a particle of the divine soul [Jiv-atma]'. Sir Jadunath Sarkar: The History of Bengal [Vol: 2]: p. 221.

[৪] The new life breathed into Bengal Hinduism by Chaitanya's creed, brust forth in another direction. The Vaishnav Gosāins set themselves to converting the aboriginal tribes and thus brought a new light into their lives after age sof neglect, contumely and superstition. ibid. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'বহু শূদ্র এবং অল্প সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও এই ধর্ম গ্রহণ করিল।' ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' (

[৮] তুলনীয়: 'অবশ্য মধ্যযুগের অন্তপর্বে সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যে খুব খর্ব হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে কায়স্থ নরোত্তমের শিষ্য হইতেছেন, তিনি ব্রহ্মণদের শিরে চরণস্পর্শদান করিতেছেন — এই রূপ বর্ণনায় অধুনিক ঐতিহাসিকগণ খুব উল্লাসবোধ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ-ইতিহাসে ব্রাহ্মণ প্রভাবকে খর্ব না করিয়া বরং নরোত্তমকে ব্রাহ্মণরূপে প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে।' ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খণ্ড,

—

মহাপ্রভু প্রসঙ্গে যুগাবতার

ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্ম বা সাধনা নিয়ে যে কোন গোঁড়ামী ছিল না, এ ব্যাপারে যে তিনি ছিলেন অতিশয় উদারচেতা তা আমাদের জানা। যিনি 'যতমত তত পথে'-র প্রবক্তা, তিনি যে ধর্ম কিংবা সাধন মার্গের ব্যাপারে সহনশীলতার পরিচয় দেবেন, সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। আমাদের জানা আছে যে ঠাকুর নিজেও ইসলাম, খ্রীস্টান ইত্যাদি নির্দেশিত পথে দেবারাধনা করেছেন। তথাপি তিনি ছিলেন মূলতঃ শাক্ত, কারণ তিনি কালীর উপাসক ছিলেন। আমাদের ধর্মীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে এসেছে। কিন্তু ঠাকুর ছিলেন এসব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। আমরা লক্ষ্য করি বৈষ্ণবদের সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি। বিশেষতঃ গোস্বামী দেখলেই ঠাকুর মাথা নত করে প্রণাম করতেন, কখন কখন আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতও করতেন। রাধিকা গোস্বামী অদ্বৈত বংশোদ্ভূত জেনে তাঁকেও ঠাকুর হাতজোড় করে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। অতএব এ হেন ঠাকুর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত হবেন তা বলা বাহুল্য। এখন দেখা যাক এক অবতার আর এক অবতার প্রসঙ্গে কি ধারণা পোষণ করতেন, চৈতন্যদেব সম্পর্কে ঠাকুর কিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর কোন আদর্শের প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তির অবতার বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন মহাপ্রভু জীবকে ভক্তি শেখাতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অধর, মনোমোহন, শিবচন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, হরিশ প্রভৃতি ভক্তদের কাছে এখন থেকে একশত তিন বৎসর পূর্বে মহাপ্রভুর তিনটি অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন চৈতন্যদেবের যে তিনটি অবস্থা হ'ত তা হল যথাক্রমে বাহ্যদশা, অর্ধ-বাহ্যদশা এবং অন্তর্দশা। বাহ্যদশায় চৈতন্যদেবের স্থূল ও সূক্ষ্ম মন থাকত। এই দশায় মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন করতেন। অর্ধ-বাহ্য দশায় কারণ থাকত শরীরে আর মন যেত কারণানন্দে। অর্ধ-বাহ্যদশায় মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করতেন। আর মহাকারণে যখন তাঁর মন লয় হয়ে যেতো তখন হ'ত তাঁর অন্তর্দশা। অন্তর্দশায় মহাপ্রভু সমাধিস্থ হতেন।

মহাপ্রভুর কথায় কথায় উদ্দীপন হ'ত। ঠাকুর বলেছেন উদ্দীপন সকলের হয় না, কেবল যারা বিষয় বুদ্ধি থেকে মনকে সরিয়ে আনতে পারে, তাদেরই উদ্দীপন হয়। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন দেশলাই ভিজে থাকলে শত চেষ্টাতেও জ্বালান যায় না। কিন্তু দেশলাই শুষ্ক থাকলে সামান্য ঘর্ষণেই জ্বলে ওঠে। অনুরূপভাবে বিষয় বিমুক্ত মন যা নাকি ঈশ্বরীয় চিন্তায় পূর্ণ তাতেই উদ্দীপন হয়। ঈশ্বরের ওপর ভালবাসা ব্যতিরেকে এই উদ্দীপন সম্ভবপর হয় না। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর মহাপ্রভুর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেব যাচ্ছিলেন মেরগাঁর কাছ দিয়ে। শুনলেন যে ঐ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈরী হয়। ব্যাস্, অমনি মহাপ্রভু ভাবে বিহ্বল হলেন। কারণ, হরিনাম সংকীর্ত্তনে যে খোল বাজে।

শুধুমাত্র নীরস পাণ্ডিত্য কিংবা পুঁথিগত বিদ্যা যে অসার, একমাত্র ভক্তিই সার, তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ঠাকুর মহাপ্রভুর জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন।

তখন চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন করছেন। একদিন একস্থানে একজনকে

তিনি গীতা পড়তে দেখলেন. দেখলেন দূরে বসে অন্য একজন তাই শুনছে আর কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চৈতন্যদেব ক্রন্দনরত ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন যে গীতা পাঠের অর্থ কিছু অনুধাবন করেছে কি না। ক্রন্দনরত ব্যক্তিটি মহাপ্রভুকে জবাব দিল যে সে কিছুই বুঝছে না। তখন মহাপ্রভু তার কাছে তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে লোকটি বললে সে দেখতে পাচ্ছে অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা বলছেন। তাই দেখে তার কান্না পাচ্ছে।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। কোনো মতে বলা হয়েছে মহাপ্রভু পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। কবি জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন রথের সময় রথাগ্রে নৃত্য করার কালে মহাপ্রভুর পায়ে ইঁট ফুটে যায়, শেষ পর্যন্ত তাই বিষাক্ত হয়ে তাঁর প্রাণ নাশের কারণ হয়ে ওঠে। আর একটি মতে বলা হয়েছে মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আর ওঠেন নি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের তিরোধান বিষয়ে শেষোক্ত মতটিকেই বিশ্বাস করবেন। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ হ'ল গৌরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম। এ সামান্য প্রেম নয়, এ প্রেমে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের যে দেহ আমাদের এত প্রিয়, তাও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। আর তাই তিনি অবলীলাক্রমে সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

১৮৮৩ সালের ১৮ই জুন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। পেনেটীর মহোৎসবে ঠাকুর উপস্থিত হয়েছেন। রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব। মহোৎসব ক্ষেত্রে পৌঁছানোমাত্র ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলে মিলে নৃত্যরত হলেন আর মাঝে মাঝেই সমাধিস্থ হতে লাগলেন। অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুর নৃত্য করলেন; অপরপক্ষে বাহ্যদশায় ধরলেন নাম —

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা দুভাই এসেছেরে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা দুভাই এসেছে রে।
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়, যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
নদে টলমল টলমল করে — গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

সেদিন মহোৎসবে উপস্থিত অসংখ্য ভক্তের মনে হয়েছিল বুঝিবা ঠাকুরের ভেতরেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে। কেউ কেউ এমনও ভেবেছিলেন যে রামকৃষ্ণ বুঝিবা সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের মাতা পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের পরামর্শ দিতেন। তাঁর ভাষায়, মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না।' এই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের মাতৃভক্তির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত', তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে যাব'।

ঠাকুরের এক শিষ্য ভবনাথ। একদিন ভবনাথ কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরকে বললেন ক্রাইস্ট, চৈতন্য এঁরা সকলেই বলে গেছেন যে সকলকে ভালবাসবে। রামকৃষ্ণও এই বক্তব্য সমর্থন করলেন কারণ সর্বভূতেই ঈশ্বর বিদ্যমান। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করলেন যে দুষ্টলোককে দূর থেকে প্রণাম জানান উচিত। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর চৈতন্যদেবের আচরণের পরিচয় দিলেন। বললেন তিনিও, 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সম্বরণ।' শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

অধর একদিন চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনিও ভোগ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি কি ভোগ করেছিলেন? অধর জবাব দিলেন, চৈতন্যদেব ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। কত মান ছিল তাঁর। ঠাকুর এর জবাব দিলেন এই বলে, 'অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে কিছু নয়।'

ঠাকুর বলেছেন ভাব ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাণকৃষ্ণকে বলেছেন হৃদের বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁর গৌরাঙ্গ দর্শনের কথা। বলেছেন গৌরাঙ্গকে তিনি দেখেছেন কালাপেড়ে কাপড় পরা অবস্থায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী উপস্থিত হয়ে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ উপভোগ করেছিলেন। ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিজয়, কেদার, বাবুরায়, নারাণ, মাষ্টার, তাছাড়া বৈষ্ণবচরণ। দিনটি হল ১৮৮৪ সালের ১লা অক্টোবর। বৈষ্ণবচরণের কীর্তনগানে অভিভূত ঠাকুর তাকে 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়' গানটি গাইতে বললেন। সেইমত বৈষ্ণবচরণ গানটি গাইলেন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মধ্যে দেখা গেল ভাবান্তর। তিনি নিজেই গৌরাঙ্গের ভাবে গান ধরলেন —

ভাব হবে বৈ কি রে।
ভাবনিধি গৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কি রে॥
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে।
যার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে)।
গোড়া ফুকরি ফুকরি কান্দে; গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

মাষ্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুজ্যে প্রভৃতিদের সঙ্গে ঠাকুর বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারে গেছেন 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখতে। বারংবার তিনি সমাধিস্থ হতে লাগলেন। কখনও তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। কখনও তিনি উৎসুক হয়ে অভিনয় দেখেন। আবার কখনও সঙ্গের শিষ্যদের কাছে কিছু কিছু মন্তব্য করেন। অভিনয় শেষে ঠাকুর মহানন্দে প্রথমে মুখুজ্যেদের কলে পৌঁছালেন, তারপর সেখান থেকে রওনা হলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। আনন্দে ঠাকুর পথিমধ্যে গান ধরলেন —

গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই।

বস্তুত, ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রদত্ত উপদেশাবলীতে, তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে আলোচনায় সাধন মার্গের কথা প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে। মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে ঠাকুরের কৌতূহল, শ্রদ্ধা এবং গভীর অনুধ্যান সহজেই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। বিশেষত, মহাপ্রভুর মূল্যায়নে ঠাকুরের গভীর অন্তর্দৃষ্টি সঞ্জাত মন্তব্য এবং বিশ্লেষণ আমাদের একই সঙ্গে চমৎকৃত করে এবং নানা সংশয়ের অবসানে সহায়তা করে থাকে।

ষটচক্রতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য

অধ্যাপক ধ্রুবরঞ্জন ভট্টাচার্য

ধর্মের অর্থই ঈশ্বরের অপরোক্ষানুভূতি। আত্মোপলব্ধিই ধর্মের মূল কথা। এই সত্যের আলোকে ভারতের সনাতন ধর্ম উজ্জ্বল। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ না হইলে আত্মদর্শন হয় না। "গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্ধ্বে লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম আছে। তাহার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী-মুখে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন। তাঁহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি আছেন।" "এই কুণ্ডলিনীই নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি। তাঁহার দুই মুখ এবং বিদ্যুল্লতাকার ও অতি সূক্ষ্ম। দেখিতে অর্দ্ধ-ওঙ্কারের প্রকৃতিতুল্য।" (নিগমানন্দ লিখিত যোগীগুরু গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায়)। স্বামী শ্রীনিগমানন্দ পরমহংস বলিতেছেন — "মূলাধারাস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি যাবৎ জাগরিত না হইবেন তাবৎকাল মন্ত্র জপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল। যদি পুণ্যপ্রভাবে সেই শক্তিদেবী জাগরিতা হয়েন, তবে মন্ত্রজপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে।"

শুধু কুণ্ডলিনী জানিলেই হইবে না, মানবদেহের ষটচক্র জানা বিশেষ প্রয়োজন। ষটচক্র না জানিয়া সাধনকর্ম করিলে উহা নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়। ষটচক্র মানবদেহের কোথায় কিরূপে অবস্থিত তাহা বুঝিতে হইলে সদগুরুর আশ্রিত হওয়া আবশ্যক। এখন সদগুরু কে ? স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় — যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহাকে গুরু বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। (স্বামীজীর বাণী ও রচনা। চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ২২)

এহেন সদগুরুর কৃপায় ষটচক্র সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ সম্ভব। কিন্তু ষটচক্র সম্পর্কে জানিবার পূর্বে শরীরের অনেক নাড়ীর মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ী সম্পর্কে জানা আবশ্যক। উক্ত তিনটি নাড়ী হইতেছে "মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বামপার্শ্বে চন্দ্রাধিষ্ঠিতা ঈড়া নাড়ী ও দক্ষিণপার্শ্বে সূর্যাধিষ্ঠিত পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে ও উভয় নাড়ীর মধ্যস্থলে মেরুদণ্ডের রন্ধ্রমধ্যে সমুদয় মেরুদণ্ড ব্যাপিয়া মূলাধার পদ্ম হইতে মস্তক পর্যন্ত বিস্তীর্ণা সুষুম্না নামে তৃতীয়া একটি নাড়ী আছে।" (যোগাচার্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ গিরি মহারাজ-এর 'যোগ ও সাধন রহস্য' গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত)

প্রত্যক্ষানুভূতির যাবতীয় ক্রিয়াই মধ্যবর্তী নাড়ী সুষুম্না কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়। গুরুর কৃপা বলে শক্তিসঞ্চারের ফলেই হউক অথবা গুরুদত্ত বীজ লইয়া সাধন করিতে করিতে সুষুম্না দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন নাম-এর প্রবাহ হইতে আসে গতি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া উঠেন। ধর্মের শুরু এখানেই। কুণ্ডলিনী জাগরণের লক্ষণ অশ্রু, কম্প, স্বেদ ও পুলক প্রভৃতি। ৬টি চক্র ভেদ করিলেই ধর্মের পূর্ণতা। প্রথম চক্র মূলাধার পদ্ম — "সুষুম্নার অধোমুখ সংলগ্ন, লিঙ্গের অধোভাগে ও গুহ্যদেশের উর্ধ্বভাগে আধার পদ্ম অর্থাৎ মূলাধার চক্র আছে" (যোগ ও সাধন রহস্য)। মূলাধার পদ্ম হইতে শক্তি উপনীত হয় ২য় চক্র স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। "লিঙ্গমূলে সংস্থিতা দ্বিতীয় পদ্মের নাম স্বাধিষ্ঠান (নিগমানন্দের যোগীগুরু - পৃঃ ৪৭)" ইহার পর শক্তি উত্থিত হয় তৃতীয় চক্রে। "নাভিদেশে তৃতীয় পদ্ম মণিপুরে অবস্থিত।" (যোগীগুরু পৃঃ ৪৮) ইহার পর শক্তি আসে চতুর্থ চক্রে। "হৃদয়ে বন্ধুক পুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট দ্বাদশ দলযুক্ত চতুর্থ পদ্ম অনাহত। এখানে শক্তি উঠলে জ্যোতি দৃষ্ট হয়। এখান হইতে শক্তি যখন পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে উত্থিত হয়, তখন ঈশ্বরীয় কথা শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। পঞ্চম চক্র অতিক্রম করিয়া শক্তি আসে ষষ্ঠ চক্রে বা আজ্ঞাচক্রে। "ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে শ্বেতবর্ণ দ্বিদল বিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্ম অবস্থিত। (যোগী গুরু গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায়)। এখানে সর্বদা ঈশ্বরীয় রূপ

দর্শন হইয়া থাকে। ইহার পর শক্তি সপ্তম চক্র — সহস্রারে উপনীত হয়। এখানে শক্তি এলে সাধকের সমাধি ঘটে ও ব্রহ্ম স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটে। অবতার পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবেরও এইরূপ মহাভাব হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাসারে বর্ণিত হইয়াছে — "চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হত। ১ম, বাহ্যদশা — তখন স্থূল আর সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকত। ২য়, অর্ধবাহ্যদশা — তখন কারণ শরীরে। কারণানন্দে মন গিয়েছে। ৩য়, অন্তর্দশা — তখন মহাকারণে মন লয় হত। বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্থূল শরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণ শরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ, মহাকারণ, পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হত তখন সমাধিস্থ। — এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়সমাধি। চৈতন্যদেবের যখন বাহ্যদশা হত, নামসংকীর্তন করতেন। অর্ধবাহ্যদশায়, ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করতেন। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ হতেন।"

চেতনার একটি ঝলক

বীরেন চক্রবর্তী

স্বপ্ন তৈরি হয় শৈশবে। যা চিরায়ত সেটা মানুষকে স্বীকার করে নিলেই লোকায়ত। তার রীতি-মানসিকতা-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটলেও কালের স্পন্দনে প্রাকৃতিক অস্তিত্বের মূলকেন্দ্রকেই গ্রহণদ্বারা বৃদ্ধি পেতে থাকে ব্যক্তিমানস, মনন এবং ব্যক্তিত্ব। পাশ্চাত্য ট্র্যাডিশন্ ও ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট্ দুটো ওতপ্রোত কথা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছে ব্যক্তি-বিচারে। বীজ না দেখলে, না চিনলে যেমন বৃক্ষের প্রজাতি জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি শ্রীচৈতন্যের শৈশব না চিনলে হয়তো পূর্ণ চেতনার অধিকারী বৃহৎ মহৎ শ্রীচৈতন্যকে আমাদের জানা বা বোঝার মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে। বর্তমানে বিজ্ঞান বায়ো-কেমিস্ট্রির উপরে জোর দিয়ে জেনেটিক্স এবং বংশধারার গুরুত্ব আরোপ করছে। শিশু-চেতনার স্তর আমাদের বুঝতে বাধা কোথায়! আমরা নিজেরাই সম্ভবতঃ যতটা ভক্ত ততটা সত্য নই। সংক্ষেপে গোটাকয় পরিচিত অথচ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা স্মরণে আনতে পারি।

১। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃভূমি বা জন্মস্থান ছিল শ্রীহট্ট। প্রাকবিবাহ জীবনে যখন তিনি নবদ্বীপে আসেন তখন সঙ্গে ঠিক কোন কোন টুকিটাকি নিয়ে এসেছিলেন তা বলা না গেলেও নবদ্বীপের বাড়িতে প্রাত্যহিক পূজ্য বিগ্রহ মূর্তি ছিল, অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্তি। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই মূর্তির বয়স পাঁচশো বছরের বেশি। নবদ্বীপ অঞ্চলে, বিশেষতঃ বল্লাল ঢিবি খননকালে হুবহু এই রকমের আর কোনো মূর্তি পাওয়া যায়নি। এমনকি আশেপাশে কোনো গ্রামেই এই ধরনের কোনো মূর্তি পূজা হ'তো কিনা তারও প্রমাণ মেলেনি। মূর্তির মঙ্গোলিয় চক্ষুগঠন ইঙ্গিত দেয় যে পুরনো আসাম অঞ্চলের শ্রীহট্ট স্থান থেকে এই বিগ্রহকে আনা হয়েছিল। অধোক্ষজ মূর্তির আরেক নাম অতীন্দ্রিয় বিষ্ণু।

২। রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হলেও, বয়সে ছিলেন বড়। রূপ গোস্বামী তদানীন্তন নবদ্বীপের বাসিন্দা এবং নবদ্বীপকে তাঁর খুব খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর লেখা 'নবদ্বীপাষ্টকম্' তখনকার নবদ্বীপের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সাক্ষ্য দেয়। সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ দেয়া হ'লো।

"আমি নবদ্বীপে ধ্যানমগ্ন হচ্ছি। আনন্দ ও আশীর্বাদপুতঃ পবিত্র স্বর্গীয় দীর্ঘিকা (দিঘি)-র ধারেই যা অবস্থিত। এই দিঘি গৌড়রাজ্যে (বঙ্গে)। অদূরে পবিত্র স্বর্ণবরণা নদী (ভাগীরথী অথবা গঙ্গা) প্রবাহিত। এই নদীর ঘাট স্বর্ণসিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো। এখানে গৌর (শ্রীগৌরাঙ্গ) স্নান করতেন। আমি এইরকম মনোরম নবদ্বীপে ধ্যানে আসীন হলাম। মধ্যবর্তী স্থলভাগে একখানি বাড়ি। সর্বদা একদা মিশ্র 'পুরন্দর' (জগন্নাথ মিশ্র) যেখানে পরিবার সহ বসবাস করতেন এবং এই বাড়ি তাঁরই। শ্রীগৌর-এর জন্মস্থান এবং অন্যান্য লীলাক্ষেত্র এখানেই ছিল। আমি নবদ্বীপে ধ্যানস্থ হলাম।"

৩। নবদ্বীপ এবং নদীয়া (পুরনো নাদ্দিয়া কিম্বা নেদ্দীয়া) একই স্থলে ছিল বুঝতে পারা যায় — স্মিথ, রেনেল, ভ্যানডেনব্রুক প্রভৃতিদের অঙ্কিত মানচিত্র ও দলিল দেখলে। এটাই পূর্বে সেনরাজাদের রাজধানী ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে পরিত্যক্ত, (হয়তো তারও পূর্বে বৌদ্ধ পালরাজাদের) রাজপ্রাসাদ এখনও 'বল্লাল ঢিবি' নামে পরিচিত জায়গার ধ্বংসাবশেষে লুক্কায়িত। এই 'বল্লাল ঢিবি'-র কাছেই রূপগোস্বামী উল্লিখিত 'দীর্ঘিকা'।

৪। বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'

পড়লে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য পাওয়া যায়। কাজিপাড়া এবং মোল্লাপাড়ার লোকেরা শ্রীচৈতন্যের কীর্তন ধ্বনিতে যখন বিরক্ত হতেন তখন বুঝতে পারা যায় শ্রীচৈতন্যের বাসভূমি থেকে প্রশাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় তুষ্ট মুসলমান সমাজের লোকজন কাছাকাছি বসবাস করতেন।

৫। সবকিছু মিলিয়ে তুলনামূলক হিসাবের অঙ্কে দেখা গেছে শ্রীচৈতন্যের জন্মতারিখ ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৪ই মার্চ, ১৪৮৬ খৃস্টাব্দ, বুধবার, দোলযাত্রার দিন। পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, কৃষ্ণপক্ষ একই সঙ্গে তিন, পড়েছিল সেইদিন।

৬। ভূবিদ্যা বিশারদ কে, এন, মুখার্জী লিখিত 'A study for Sri Chaitanya's birth-place' পুস্তক পড়লে মায়াপুর অঞ্চল নির্ধারিত হয়। এখানকার মৃত্তিকার ঘণত্ব, কাঠিন্য, গঠন প্রভৃতি প্রমাণ দেয় যে এই ভূমি অত্যন্ত প্রাচীন এবং রূপগোস্বামী বর্ণিত নবদ্বীপ এখানেই অবস্থিত ছিল। বর্তমান নবদ্বীপ শহর তৈরি হয়েছে এবং তার বৃদ্ধি ঘটেছে পরবর্তী পাঁচশো বছরে নদীর গতিপথ পরিবর্তনে এবং বিভিন্ন প্রশাসন কারণে। বর্তমান নবদ্বীপ নগরের মাটি তুলনায় অনেক নরম এবং পলল। যেখানে বৌদ্ধ পালরাজাদের এবং পরে সেনরাজাদের রাজধানী ছিল সেই জমিতো কমপক্ষে এক হাজার দু'হাজার বছর ধরে সৃষ্ট হতে বাধ্য। 'বল্লাল ঢিবি' ও 'মায়াপুর' অঞ্চলের মৃত্তিকার বয়স সেই পরিমান।

অতএব এই সেই ভূমি যেখানে জগন্নাথ মিশ্র বাড়ি করেছিলেন এবং যেখানে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হলেন, হামাগুড়ি দিতে গিয়ে ভূমিসান্নিধ্যে এলেন, দাঁড়িয়ে হাঁটতে শিখে বারম্বার ভূলুণ্ঠিত হলেন যিনি, তিনি তো ভূমিকে প্রথমে পারসেপশন্ ও একটু বড় হ'য়ে মেমোরাইজেশন্ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন কেন্দ্রিক মানবিক বিকাশের পথ খুঁজে নেবেনই; এটাই স্বাভাবিক। এটা ব্যক্তি সর্বস্ব না হ'য়ে সমগ্র-সর্বস্ব কেন হ'লো সেটাও বিবেচ্য। তিনি শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে ঘরে এবং বাইরে আনুমানিক কি কি দেখেছিলেন, শুনেছিলেন এবং অভিজ্ঞতায় পেয়েছিলেন তার একটা তালিকা করা যাক। এই তালিকার সঙ্গে তুলনামূলক বিবেচনা জাগ্রত করলে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে চেতনা-অনুস্মৃতির অনুসিদ্ধান্তকে।

(ক) ঘরে ছোটবেলায় দেখতেন এক বিগ্রহ, অধোক্ষজ বিষ্ণু বা অতীন্দ্রিয় বিষ্ণু। পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুজো করতেন। উপনয়ন যখন হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য বা নিমাইকে যে মাঝে মধ্যে পুজো করতে হ'তো, অন্ততঃ বিগ্রহের সামনে বসে গায়ত্রী জপ করতে হ'তো, তা আমরা বুঝতে পারি। মূর্তিটাকে বাহ্যিক আমরা এখন যেমন যোগপীঠে দেখছি তিনিও বাল্যে-কৈশোরে দেখেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন এই বিষ্ণু উপাসনার ধারা ও উৎপত্তি সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকায় বিশদ চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা কিন্তু এখানে সাধারণ চোখে দেখতে চাইছি, যাতে ত্রুটি ঘটতে পারে। সেই ত্রুটির ঝুঁকি নিয়েই একটু অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। 'অতীন্দ্রিয়, বিষ্ণুর প্রচলিত অর্থ হচ্ছে যা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে। অর্থাৎ ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে হয় 'অতীন্দ্রিয়'-র প্রতীক বিগ্রহ মূর্তিকে 'অধোক্ষজ' পদ্ধতিতে। তাই বিমূর্ত ভাবনা অধোক্ষজ। কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত ত্রি-ভাষী অভিধানে অর্থ রয়েছে — যাঁর অক্ষ (চক্র) অধোমুখী। আর সত্যিই তো; শ্রীচৈতন্যের গৃহ-বিগ্রহের মূর্তির চক্র অধোমুখী। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ এবং গোপাল ভট্টর 'হরিভক্তি বিলাস'-এ শ্রীকৃষ্ণের চব্বিশ প্রকারের রূপ বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে তেইশ-তম রূপ হচ্ছে অধোক্ষজ। আমরা যেমন বলি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, তেমন নয়। পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র হিসাবে ধরতে হবে সর্বনিম্ন দক্ষিণহস্ত থেকে। চক্রের স্থান নিম্নগামী। কৃষ্ণের সুদর্শনচক্রের কথা মনে এলেই ভয়ঙ্কর কিছু ভাবনা আনে।

বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য এমন এক বিগ্রহ দেখতে অভ্যস্ত হলেন যিনি প্রেমিক এবং ঊর্ধ্বগামী গদা ও শংখের দ্বারা নিনাদিত কাঠিন্যের আবরণে অত্যন্ত কোমল-ভীষণ পদ্ম ও চক্রের মতো। কোমল কাটলে দাগ রাখে না তাই চক্রের স্থান নিম্নগামী। বালক বয়সে বারম্বার এই মূর্তি নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতি-কোষে শাঁসের কাজ করেছিল। 'কৃষ্ণ' শব্দ, উপাধি, ব্যুৎপত্তি, ইতিহাস প্রভৃতির তাৎপর্যগত দিকগুলো আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন তাতে ধরতে পারা যায়, 'কৃষ্‌' এমন একটা ধাতু যা দিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় অনেক কিছু করা সম্ভব। মানুষকে ভালোবাসাও একটা 'কৃষি'।

(খ) শ্রীচৈতন্য ঘরে দেখছেন বিগ্রহ আর পিতার মুখ থেকে নিশ্চয়ই শুনতেন কোত্থেকে তাঁরা নবদ্বীপে এসেছিলেন, সেই জায়গাটা কেমন ছিল যেখানে তাঁর পিতা জন্মেছিলেন। শিক্ষায় যেমন স্মৃতি ও শ্রুতির কাজ, ঠিক তেমনি 'শ্রুতি' এমন একটা উপাদান যে শিশুমনের বীজকে সজীব রাখে। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অনেক ব্যক্তি আছেন যারা পশ্চিমবঙ্গেই জন্মেছেন, কথা বলেন গাঙ্গেয় উপত্যকার অথচ তাদের পূর্ববঙ্গীয় পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা, পরিমণ্ডল, কেমন ছিল সেই সম্পর্কে মনের কুটিরে কল্পরাজ্য রচনা করেন এবং পুরনো আচার পদ্ধতিও পালন করেন পিতা-পিতামহ প্রভৃতির মুখ থেকে শুনে। এই শ্রুতি-মাধ্যম-অনুস্মৃতি সন্তানদের একরকমের মাইগ্র্যাণ্ট্‌-মাইণ্ড্‌ (migrant-mind)-এর অধিকারী করে। নিমাই যে পিতৃমুখে শ্রীহট্টের গল্প শুনেছেন তা বোঝা যায় বড় হ'য়ে যখন তিনি শ্রীহট্ট অভিমুখে যাত্রা করেন। এইসব চরিত্রে সাধারণ জিনিসকে উপেক্ষা করার যোগ্যতা দান ক'রে ঔদাসীন্যে পূর্ণতা প্রাপ্তির সাহসী অধিকার দেয়। অতএব সাবালক 'চেতনা' যদি মাতা, স্ত্রী, আবাসস্থল এমনকি জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে বেপরোয়াভাবে বহির্মুখে বা বহির্দেশে চলে যায় তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিদেশে যত ভারতীয় রয়েছেন ও তাদের সন্ততিদের অধিকাংশই এইরকম মাইগ্র্যাণ্ট্‌-মাইণ্ড্‌-এর বিচ্ছিন্ন-অবিচ্ছিন্ন মানসিকতায় পুষ্ট। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের কাছে জীবিকা অর্জন, স্বভাবতঃই আর্থিক পাওয়া না পাওয়ার আশা-নিরাশার বোধ প্রধান। অতএব এই বোধ ভবিষ্যতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক হ'তে বাধ্য। ঠিক তার বিপরীত, যাঁরা সামগ্রিক চেতনার কৃষিতে অংকুরিত হ'য়ে আত্ম-মননকে বিকশিত করে সকলের সঙ্গে নিজেকে একটা অংশ বলে প্রস্ফুটিত হন। আমি নয়, আমরা। আমরা যাকে মেধা বা প্রতিভা বলি তা সমগ্রচেতনার কৃষি। তাই উৎকর্ষ। তাই প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টিশীল। অর্থলোভ সব নয়, পরিবেশের আকর্ষণ-অভিজ্ঞতা বোধবিকাশের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং প্রশ্ন আসে নবদ্বীপের মনুষ্যসমাজ-পরিবেশকে কি শ্রীচৈতন্য অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না? নবদ্বীপের স্বর্ণময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল শ্রীচৈতন্যকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করলেও, সামাজিক পরিবেশকে আদৌ সহ্য করতে পারেন নি।

(গ) তুরস্কের মুসলমান বিজেতারা নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করার পর এখানকার সামাজিক জীবনে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। ইতিহাস অবশ্য লক্ষ্মণ সেনকে বিরাট কিছু ধরেনি। সেন রাজাদের সেখানেও ঘাটতি ছিল প্রচুর। যাহোক, এই ঘটনার ঠিক তিনশো বছরের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের বাল্যকাল নবদ্বীপ অঞ্চলেই কাটে। বাল্যাবস্থায় খেলতে গিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরতে গিয়ে, আঞ্চলিক অনুষ্ঠান-উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে, পাড়ায় বৃদ্ধদের কথাবার্তা শুনে, মাতুলালয়ের আত্মীয় স্বজনের কাছে পুরাতন ঐতিহ্য ও বর্তমান পরিবর্তনের কাহিনীকে অনুধাবন ক'রে নিমাই সর্বদাই যদি অসংলগ্ন অযৌক্তিকতা অনুভব করেন তবে বাল্য-মননে সেটাই হবে অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মসিদ্ধ। তাঁর

মাতুলালয় ছিল নবদ্বীপের পুরাতন বংশের স্মারক। অতএব সেই বংশকে কেন্দ্র ক'রে যে পরিজন, তাদের মুখে পুরনো নবদ্বীপের অনেক গৌরব-গল্প শোনা স্বাভাবিক। প্রশ্ন থেকে যায়। তাই যদি এই হয়, তো এমন ধারা কেন? একদিকে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অন্যদিকে বড়-ছোট জমিদারদের আচরণ-ব্যবহার। এদের কোন অসুবিধা হয় না। যে যখন প্রশাসনে আসে তখন পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা, জমিদাররা তাদের পক্ষে। ওরা নতুন মুসলমান শাসকদের পক্ষেই থাকবে। যে শিকারবাদী, তার পক্ষ সুবিধাবদী। এদের বোধ-বিকাশ স্থূল। নইলে জীবিকা অর্জন হয় না। এদের কখনো প্রতিবাদী মন তৈরি হয় না। বে-পরোয়া না হ'লে প্রতিবাদ করবে কি ভাবে? সেখানে, মানে বে-পরোয়া হাতিয়ার গদা ও শঙ্খ। সেখানে, মানে প্রতীক 'কৃষ'-ধাতব প্রসঙ্গ উঠতে বাধ্য। কিন্তু ছোট-বড় জমিদারদের স্থূল রসিকতা, ভাঁড়ামো সেইসব কবি, কথকঠাকুর, গায়ক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত প্রভৃতিকে পছন্দ করবে যারা জমিদারদের স্থূল রসিকতা ও ভাঁড়ামোকে স্তাবকতার দ্বারা উৎসাহিত করতে পারবে। শ্রীচৈতন্য বাল্যাবস্থায় সেইসব দেখেছিলেন, শুনেছিলেন। যৌন উত্তেজক ও সস্তায় বাজিমাৎ করা স্রষ্টারা জমিদারদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। অথচ সমাজ সচেতন স্রষ্টারা অবহেলিত, ঘৃণিত, বঞ্চিত হচ্ছেন। তদানীন্তন প্রচলিত অনেক চমৎকার 'কৃষ্ণলীলা'-র মধ্যেও কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক স্থূলবস্তুর সন্ধান মেলে। এইসব স্থূল জিনিস অনেক সৎ অ-বৈষ্ণবকেও বিরক্ত করে তুলেছিল। তদানীন্তন বৈষ্ণবধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রচলিত 'বিধি-ভক্তি' থাকলেও 'প্রেম' ছিল অনুপস্থিত। 'শুদ্ধভক্তি'-কে সমালোচনা ও ঘৃণা করা হ'তো। বাল্যাবস্থায় শ্রীচৈতন্য সমাজের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরকম বিভিন্ন অযৌক্তিক অসংলগ্নতা দেখে যদি স্বাধীন-কল্প-রাজ্যে গোটা ব্যাপারটাকেই পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন তবেই আমরা বাস্তব এবং যুক্তি সম্মত বলবো। তিনি ছোটবেলায় মোল্লাদের মুখে 'কোরাণ' এবং ব্রাহ্মণদের কাছে 'বেদ' শুনেছেন এটাই পারিপার্শ্বিকতা প্রমাণ দিচ্ছে। ঘোষ, মিত্র উপাধিযুক্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ছিলেন। আর এই উপাধিগুলো বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি। কাজেই বৌদ্ধ-জৈন ধারার প্রভাবও দেখেছিলেন। মূল-এর সংগে ওই সমাজভুক্ত লোকগুলোর ব্যবহারিক জীবন কত পৃথক! আজীবন যেসব স্থান ভ্রমণ করেছেন সেসব স্থানের মন্দির গাত্র এবং প্রাচীর গাত্রের ভাস্কর্যগুলো এখনো বিদ্যমান। তিনি সেই সব ভাস্কর শিল্পের মাটিতেই দিন কাটিয়েছেন যে শিল্পগুলো নান্দনিক দিক দিয়ে রসে-উত্তীর্ণ। কী অসাধারণ নান্দনিক তৎপরতার উপভোগ ক্ষমতা! তিনি মনে মনে প্রশংসা করতেন বলেই আশ্রয় নিতেন। নন্দন সেই চেনে, যে মূল জানে। অপ্রকাশিত এই সমালোচক চেতনার অধিকারী হয়েছিলেন বালক বয়সে হয়তো প্রাসাদ-অট্টালিকা দেখে ও চিনে।

অতএব যে চেতনাকে, যে পূর্ণ শ্রীচৈতন্যকে আমরা পাই তার বীজ নিহিত ছিল বাল্যেই। বালক নিমাইকে না চিনলে শ্রীচৈতন্যকে উপলব্ধি করা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সামঞ্জস্য-সংলগ্ন সর্বমুহূর্তে নান্দনিক দিকের আনন্দ হ্লাদিনী দ্বৈত-অদ্বৈত পূর্ণিমা-গ্রহণ রাধাকৃষ্ণ অনুভূতির উন্মোচন নন্দনের দ্বারাই সম্ভব। নন্দনতত্ত্ব আমাদের অনেক সাহায্য করবে শ্রীচৈতন্যকে বুঝতে গেলে। বাল্যে তিনি জানতেন ঠিক কোন ক্ষণে তাঁর জন্ম। সেই পথ ধরেই বিকশিত হয়েছেন। আমরা শুধু আ-নন্দের ভাণ্ডবহনকারী মাত্র। শ্রীচৈতন্য দিয়ে গেছেন, তিনি গ্রহণ ক'রে বাঁধিত আকারে আমাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছেন, সবটাই হয়তো অধিক। শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, সমাজে, সর্বত্র। আমাদের নেবার যোগ্যতা নেই। বাল্যাবস্থাতেই তিনি যুগ-নেতৃত্বের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তিনি যুগ-নেতা হতে পেরেছিলেন বলেই কালোত্তীর্ণ। বাল্যই এই মহৎ বৃক্ষের বীজ।

লোকসংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্য

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার সমাজ-সাহিত্য-দর্শনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় — একথা অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী অনালোকিত সমাজ ও জীবন আলোকোজ্জ্বল পথে নবযাত্রা শুরু করে তাঁরই দিব্যপদচিহ্ন বুকে ধারণ করে — সে জন্যই তা 'চৈতন্য রেনেসাঁস'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত্র নিশ্চয়ই দিব্য — কারণ কোন গ্রন্থ প্রণয়নে নয় — বিশেষ কোন প্রচারিতধর্ম দিয়ে নয় — কেবলমাত্র জীবন ও জীবন-চর্যা দিয়ে এক বিশাল ভৌগোলিক ভূখণ্ডে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করার নিদর্শনে বোধকরি পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি নজীর-বিহীন।

'লোকসংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্য' -এ পর্যায় আলোচনায় প্রথমেই একটি 'চৈতন্যবৃত্ত' দৃশ্যমান — যেখানে ক, বৈষ্ণবধর্ম খ, জীবন (চৈতন্য) গ, চৈতন্য জীবনী-সাহিত্য ঘ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ঙ, লোকসংস্কৃতি বর্তমান।

এই বৃত্তের এমনভাবেই বৃত্যাংশচ্ছেদ সম্ভব —

এই হিরণ্যদ্যুতি সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে সমাজজীবনে পরিবর্তনের দুটি সুস্পষ্ট ধারাও লক্ষণীয় —

১। স্বতোৎসারিত ধারা (Spontaneous Stream)
২। আরোপিত ধারা (Superimposed Stream)

প্রথমোক্তের মধ্যে জীবন, জীবনী, কড়চা জাতীয় – তা বিদগ্ধ ও শিক্ষিত ভক্ত জনমানসের স্বতঃস্ফূর্তরূপেরই ক্ষেত্র, দ্বিতীয় গোত্রে —

ক। দর্শন (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন)
খ। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ
গ। গৌরচন্দ্রিকা
ঘ। লোকনাট্য, কাব্যনাট্য, — প্রথমোক্ত থেকেই প্রবাহিত ধারার সূক্ষ্ম প্রবাহ দ্বিতীয় ধারায় মিলিত।

আবার জাতীয় জীবনের রেনেসাঁসের প্রবাহের ক্রম — চিত্র-চরিত্র — ভক্ত-শিষ্য — প্রশিষ্য গুরুমুখী শিক্ষাভক্তি — সাহিত্য-সমাজ-দর্শনে তথা লোকসংস্কৃতির জগতে।

তবে ডরসন কথিত লোকবিকৃতি (FAKELORE) সাহিত্যের স্তরে কখনই পর্যবসিত হয়নি — এটিই উল্লেখ্য।

এখন চৈতন্য 'ট্রাইকোটমি মডেলটি' উপস্থাপিতব্য —

তৃতীয় স্তরের রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ দ্বিতীয় স্তরের লোকায়ত জীবনের রাধাকৃষ্ণ থেকে যে ভিন্নতর তা প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের তুলনামূলক বিচারেই লভ্য। এবং এই সুস্পষ্ট ভেদরেখাই শ্রীচৈতন্যের অবদান। বড়ু-চণ্ডীদাসের সঙ্গে এখানেই বৈষ্ণব মহাজনদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। Mystic Interpretation-এ পরবর্তী পথ সুরভিত। রূপ গোস্বামীর কথায় — 'চিরঅনর্পিত যে মধুর রসাশ্রিত ভক্তি সম্পদ তাই সম্যকরূপে দান করার জন্য শ্রীচৈতন্য কৃপা করে কলিযুগে হয়েছেন অবতীর্ণ।" কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ নদীয়ায় একাই হন নি অবতীর্ণ। শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হয়ে একাত্মভাবে তাঁর আবির্ভাব —

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।।

রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপই এই চৈতন্য। রাধাভাবে তাঁর কৃষ্ণভজনা বলে পদাবলী সাহিত্যে রাধাভাবেরই প্রাধান্য। কান্তা গৌর ও কান্ত কৃষ্ণের বিচ্ছিন্ন মানসলীলা ভক্তমণ্ডলী প্রত্যক্ষ করায় তাঁরা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মহিমা করেছেন উপলব্ধি। তাই লৌকিক থেকে অলৌকিক পথে এ যাত্রা। মূলতঃ গৌরনামক বৈদুর্যমণির মুকুরে রাধাকৃষ্ণের লীলা এখানে প্রতিবিম্বিত। তিনি catalyst হয়ে অদ্বৈতভাবের অবলুপ্তির নিদর্শন। তাই — 'না সো রমণ না হাম রমণী'।

আবার লোকসংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক অবদানও দ্বিধা বিভক্ত --

প্রত্যক্ষতঃ যে সমাজবৃত্ত তা ষষ্ঠধারায় প্রবাহিত --

১। অস্পৃশ্যতাবর্জন — শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতকুলাদি বিচার
২। সাম্যবোধের আদর্শ
৩। সেবা ও পরোপকারের আদর্শ
৪। সহিষ্ণুতা
৫। স্বাবলম্বিতা
৬। অহিংসা

অর্ধ-প্রত্যক্ষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক পদও বিদ্যমান। পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণার গানও একই সুরে বাঁধা —

সই লো, মনচোরা, চিকনকালো কই রইল কই,
সই লো সই, যে অবধি কালার প্রেমে বিকাইলাম পরাণ।

অন্যোন্যের মত উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ মালদহ অঞ্চলে 'ভালভুলে' বা 'সোনারায়ের গান'-এ একই ভাবে রাধাকৃষ্ণ 'মন্তাজ' হয়েছে। এমনকি যুক্তবাংলার মুসলিম সমাজেও রাধাকৃষ্ণ স্থানলাভ করেছে গার্হস্থ্য জীবনরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে, যেমন ফরিদপুরে 'ত্যাল-সান-গুয়ার' গানে --

ও মানদারানী কার ঘরে মোর
ধরাচুরা বাশীঁড
আয়রে গোপাল মায়ের কোলে।

অথবা,

বৃন্দাবনের চান্দ
আমার হেস্যে ওঠে প্রাণ নবরসে
বিনা সুতায় বুইনো জোরে
আজি সাজাই গোকুল চান্দ।

এখানে জনমানসের পিপাসাও ত্রিধাবিভক্ত — ক) দর্শন পিপাসা খ) সাহিত্য পিপাসা গ) ভক্তি পিপাসা। এই ভক্তিই লোকায়ত জীবনকে করেছে সিঞ্চিত এবং তার প্রভাবই ঐতিহাসিক মর্যাদায় ধন্য।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূলসুর রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের আলোচনারই ফসল। শ্রীচৈতন্যের নিজস্ব কোন দর্শনের বিশিষ্ট ছাপ এখানে বিধৃত নয়। শিক্ষাষ্টকে কেবল অষ্ট-শিক্ষা তাঁর নামে প্রচারিত — যা সমাজের নিরিখে বৈষ্ণব জীবনচর্যার পথনির্দেশ। এটি যেমন লোকায়ত জীবন ভাবনার দর্পণ, তেমনি বৈষ্ণব ধর্মও সরলীকৃত ও সংক্ষেপিত।

ভক্তিপিপাসু জনগণের সংস্কৃত ও শিক্ষাজীবনেরও একটি শিষ্ট শিক্ষিত স্তর বর্তমান। চৈতন্য-জীবনীর মাধ্যমে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রভাবনা পরিবেশিত। চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' — তারই দলিল। কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত দর্শন ও কাব্যের স্বর্ণপ্রবাহ। দর্শন ও সাহিত্য পিপাসুদেরই তা আশ্রয়স্থল। অবশ্য উপরি দ্বিস্তরকে ভাসিয়েছে 'ভক্তিরসপ্রবাহ' — যা লোকায়ত জীবনকে সরস ও সজীব করে রেখেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। এখানেই শ্রীচৈতন্যের সার্থক জয়।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখ্য যে চৈতন্য পরবর্তী যুগে সাহিত্য-দর্শন সংকলনের সুবর্ণযুগ দেখা দিলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে তার স্রোত ক্রমশঃ ক্ষীয়মান, তবে লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের ধারা (কীর্তন গানে আদিবাসী সমাজের যৌথ সঙ্গীত-নৃত্যের রূপ) ক্ষীণ হলেও তা আজও অবক্ষয়িত সমাজেও নিজস্ব জীবনীশক্তিতে প্রবহমান। এখানেই তাঁর জিৎ — এখানেই তাঁর অমরত্ব।

Chaitanya a Bright Star

Dr. A. N. Perumal

It is a very good sign of progress and better prospects when a bright Star appears in the constellation. Bengal was fortunate to see a bright star in 1486 in the name of Visvambara who was destined to be famous as Mahaprabu Krishna Chaitanya in the future. Navatveepat, the small village bring forth in its womb such a great soul which powerfully shed new light into the minds of the people and showed the path of God through a kind of religious awakening. With a feeling of awareness and selflessness his mind attached with divine thoughts and quite often he seemed unconscious to this world.

Chaitanya started his life ordinarily but as a selected soul situations developed in such a way that divine force transformed him into a great one who saw nothing but love and affection to all without any distinction in the name of Lord Krishna. He made country wide journeys and visited all the important Vaisnavite shrines.

His visit to South India requires special mention. Makendrapuri in Andra Pradesh was fortunate to treat the great saint as its guest for a few days, from there Chaitanya travelled far south and reached Tiruvarankam the most famous Vaishnava temple in the banks of river Cavery. Tamilnadu feels proud and prestigious to have this notable shrine even from second century A.D. It will be renovated in a grand manner soon after the construction of the tallest Kopuram (tower) completed.

Chaitanya's visit to Tiruvarankam was really epoc making in the annals of Vaishnavism. With close contacts with the people, Chaitanya instructed certain new ways to be followed, which were accepted and practised. Vaishnavism is a very ancient faith among the people of the South. It would be useful to know something about its growth and development in Tamilnadu.

Ofcourse, Vaishnavism is one of the common faiths of the Indians in general. In Tamil it is referred to in Tolkappiyam, which as most of the scholars feel belonged to a period before sceond century B. C. Tolkappiyam mentions to a god called Mayon who was the Lord of Mullai or grasslands where cattle were reared. This god was identified with Tirumal or Vishnu.

Sangam Literature (200 B. C. to 200 A. D.) an anthology of ancient Tamil Poems speaks about Tirumal in a few places with clear indication to Vishnu cult in that period. Paripatal, a piece of literature among the Sangam works contains a few poems which are merely praises of Tirumal.

Silappatikaram, a very famous epic belonging to second century A. D. referred to Lord Vishnu as Mayon, Kariyavan (One coloured black, i.e. Krishna), Narayanan, Tirumal and Nediyon (Tiruvikrama Avatar) which shows that Vaishnava faith was with the people of South even in very ancient times.

Further in Silappatikaram, a kind of folk-dance called 'Aicciyar Kuravai' was said to be performed by the woman of the cattle rears. In that dance they impersonated Mayon (Krishna) and Pinnai (Radha) while a few others sang in praise of Radha-Krishna. From this it may be inferred that there was a form of faith in the form of Radha-Krishna worship during the time of Silappatikaram.

Moreover the Vaishnava shrines at Tiruvenkatam (Tirupati) where Lord Vishnu appears in his standing position and Tiruvarankam (Srirangam) where the Lord is seen in sleeping posture are referred to in this epic of second century A. D. All these are clear evidences to asertain the postulate that Vaishnavism was followed in the South quite a long time before.

The famous Twelve Alwars (Vaishnava Saints) helped much for the spread of this faith by their moving songs which were musical and meaningful. The period of the Alwars extended upto eighth century A. D. The poems were collected and published in the name of Nalayirativya Pirabandam. As a token sign of respect to this celebrated work it is now transliterated into Bengali and Gujarati.

In 12th century A. D. Ramanuj, who belonged to Sripermputtoor, a place about 40 K.M. from Madras, advocated Vishistatuvaitam which spread all over India. It is very clear that the South had accepted Lord Vishnu as supreme (Parabrahmam) even in times of yore.

In 1510 A. D. Chaitanya graced Tamilnadu by his holy visit to Tiruvarankam. He was received with reverance and respected with honour. Further more he is remembered with sanctified reminiscences till date. Kaudia Mut at Royapetta, in the great city of Madras keeps Chaitanya's

memory evergreen and helps his principles followed.

Namasangeertanam, a way of worship insisted by Chaitanya is encouragingly followed in certain notable temples. Tirunadanam or sacred dance of the devotees in group is seen in vogue. In the far South near Kanyakumari, there is a form of Vaisnavism called Vaikunda Swami Markkam in which Tirunadanam is considered as an integral part of worship. They smear their fore-head with white sand and also with sandal wood paste while the members of Kaudia Mut wear only Sandal paste. The influence of the great chaitanya is seen clear in the South.

Chaitanya had insisted the Nama Sangeerthana form of worship which had its persisted effect upon the people of Tamilnadu. Songs in praise of the Lord is sung in groups not only inside the temple but also in the streets. While singing, the devotees turn their minds to God and whole-heartedly appeal to his mercy. With ready zeal and zest they call to the feet of the Lord which is a sure sign of renovation of the inner-self. This shows the onward march of the mind towards redemption and further more to the ultimate goal of life.

Chaitanya seemed a revolutionary of the persisted social orders. Some kinds of restrictions and reservations ordained by the society were cut through by the preachings of Chaitanya and according to his instructions everyone humane can be with the Lord through constant pirartana. The desire to see God should be intensive and the faith in Him must be very strong. Nothing is impossible to any man devoid of caste and creed. His attachment to God should be strong and confidence perfect.

Religious tolerance was with Krishna Chaitanya which earned for him much fame and name among the various religious secretarians. Every-one developed love and affection for him. Chaitanya loved the people first without disdain of any kind and then tried to cultivate good things in them. There was nothing compulsory in his way of instruction to the people. Voluntary acceptance by the people was received with good will and kind blessing. Chaitanya had a good gathering wherever he went, ready to follow his path most willingly.

Chaitanya longed to see God and always immersed in his thoughts of the Lord. Off and on he became unconscious in his quest of Supreme Bliss. All of his thoughts and actions centred round Lord Krishna. Just like Radha,

he wanted to have his attachment to Krishna. In his thoughts of God he very often forgot the World. His inner self was always with the God. What was humane in him passed away but sincere faith in God remained so forever. Krishna-Chaitanya is a priceless gem. He is a Bright Star showing the path of deliverance to all.

Sri Krishna as Revealed in the Bhagavata and the Gita

Dr. Radhagovinda Basak

The Bhagavata declares through the mouth of Brahma—"Oh, what a good luck, Oh what a good luck it is for the cowherd Nanda and the inmates of the Vraja, as they have a friend (in Krishna) who is the Eternal Brahman in fulness and is endowed with the highest blessedness." Has not the Gita also declared in almost similar strain through the mouth of Arjuna describing Krishna thus : "You are the Supreme Brahman, the Supreme Abode, the Supreme Purity ?" The Gita is named as Brahma-Vidya and the Bhagavata calls itself a Purana, having the honour of equality with the Vedas, and at the close of Book XII Vyasadeva states thus : "The holly Bhagavata is the essence of all Vedanta Scriptures, and the person who feels Satiated by the nectar-like taste of it will never seek delight in any other treatise." So we find that the Bhagavata and the Gita are to be taken as Vedantic works and Krishna is to be regarded as the Highest Brahman therein.

The whole of the Gita teaches us all about the immanence and transcendence of God who is the creator, preserver and destroyer of the Universe and attributes this power to Krishna the Bhagavan, who instructs Arjuna by assuming the role of the Highest Brahman. The evidence of this fact lies clearly in the Vibhuti-yoga (Chapter X) where He refers to Himself (the Highest Brahman) as being Vasudeva of the Vrishnis, saying thus : I am Vasudeva of the Vrishnis"—this 'I' being the Highest Spirit or the Soul Absolute. We cannot in this connection forget another important point that all case-ending forms of the personal pronoun asmat in the Gita, e.g. অহং, মাং, ময়া, মম etc., if replaced by the same case-ending forms of the noun-stem Brahman, will be understood as yielding the same meaning, thus proving the identity of the former forms with the latter ones. The philosophers and devotees of the Nimbarka school of Vaishnavism are so fully engrossed with the idea of a Personal Highest God that they assert that that God is also Krishna who resides in Vaikuntha-loka and who is to be equated with Brahman of the Vedantic thought. It may be said here that every Sectarian religion may be regarded as universal by its adherents. In India we find that the devotees of Rama, Vishnu, Sakti, Siva and Ganapati and other deities regard their adored gods and goddesses as emanations of the Supreme Self (Brahman). There is no harm in cherishing different kinds of religious con-

ceptions of the Highest Godhood, provided the devotees do not become liable to bigotry. So the Vaishnavas or Bhagavatas should not be criticized at all, because they regard Vasudeva-Krishna as identified with the Highest Absolute Self appearing in human form called an Avatara.

In ordinary people's view Krishna was born of his human parents, Vasudeva and Daivaki, his miraculous and mysterious birth taking place in the prison-house of Kamsa, and out of fear of his imminent murder by that cruel and despotic King, the father of the newly-born babe stealthily took Him away from Mathura and by crossing over the river Yamuna at midnight kept Him with the cowherd Nanda and his wife Yosada who both reared Him up with deep love and affection as their own son. The author of the Bhagavata, however, (in Chapter 14 of Book X) has given us his own view probably the view of all Bhagavatas and Vaishnavas—that this Krishna is to be regarded as the Highest Brahman in human form, called as the most perfect of avataras (incarnation of God, the Bhagavan).

When the Highest Vagavan entered the womb of Daivaki for a birth as a human being, the gods Brahma and Siva, rishis Narada and others worshipped Him saying "O Lord, you, who are the Intelligent Self (Brahman), assume again and again, for the good of the movable and immovable world, (various) forms made of Sativa-guna (the quality of purity or goodness), which bring welfare to the Virtuous (People), but disaster to the evil-doers" In this context we should not forget a most important point mentioned in the Gita that "it is the foolish people who despise Me (Krishna) when clad in human semblance, not knowing My supreme nature that I am the great Lord of Beings." When need arises God the Absolute incarnates Himself and appears in the world in human form and the Gita also states in three most famous verses how Krishna is born as a human being and why. It is stated therein that "though Krishna (as the Absolute Soul) is up-born, the unperishable Self and also the Lord of all beings, yet He, employing Prakriti (matter which is His own) is born through His own Maya (power of thought for producing illusive forms). Whenever there is decline of righteousness and there is uprising of unrighteousness, then He creates Himself. He appears in human form from age to age for the protection of the good and for destruction of the evil-doers and (also) for the firm establishment of righteousness."

Both Vasudeva and Daivaki recognized their Son (Krishna) as none but the Highest Brahman incarnate. The Bhagavata has fully dealt with this

matter in X.3 where in a verse Vasudeva, in a worshipful eulogy, said—"O mighty Lord of the Universe, you have come down (been born) in my house with the intention of protecting the world and (I know) you will kill the armies drawn up in battle-array (against us) by kotis of demon-like commanders going by the name of royal persons (or warriors of the Kshatriya race). Daivaki also knew Krishna to be the Highest Divinity and at his birth declared thus : "Because you, the Highest Purusha, at the end of the final dissolution, hold this Universe in your own body giving (every part of it) its place in it, so the same yourself entered my womb,—Oh, this is a mockery or joke with the world of men." Again Brahma in his adoration of Krishna after having a sight of Krishna in Vrindavana used such epithets for Him as are applied by the Upanishads to Brahmān. On seeing Krishna Brahma says thus—"You are one, the Highest Self, the oldest Purusha, the True or the Real, Self-shining Light, Endless, Primordial, Eternal, Indestructible, enjoying perpetual happiness, Untinged (or Unblemished), fully second-less, free from limitations and Immortal."

Sri Ramakrishna Paramahamsa belived that God the supreme spirit, by his omnipotence manifests his divinity by assuming human form in flesh and blood and thus He sometimes appears on earth as an incarnation of Himself, and such a highly powerful person is called an avatara (God-incarnate). Hindus generally believe that Divine incarnation is a fact of facts. Divine love can be best realised by men through the grace of an avatara in person, or through their worship of the Divine incarnation during his absence. It seems quite true to say that God the Almighty incarnates Himself often in those persons (e g. Chaitanya) who are deeply in Love with the Divinity. Every man, in a way, is an avatara, a manifest power created from Divine Energy. Avataras are Divine messengers and at the bidding of the supreme self they appear on earth to quell the disturbances created by the irreligious people in human society at particular time and place, and graciously establish religious peace and preserve security of social life (Yoga-Kshema). Man can even attain salvation if he can take refuge in an avatara, or follow his teachings even after his disappearance from the world. The avataras are saviours of the world and they lift the veil of maya from the eyes of their devotees and make them realise the Almighty Infinite.

It is God or Brahman who incarnates Himself in human form only to make the devotees meet Him directly and talk with Him and enjoy His play (orlila) and feel His sweetness (madhurya) and blessedness. The great Epic Poet, Magha (c. 800 A.D.) makes Narada utter a verse in the Sisupalavadha

addressed to Krishna thus : "O Lord, if you did not come down on this earth (as an avatara) to kill those who had created trouble, then how (else) could you become an object of vision to people like myself, as you could not be comprehended even by those who are sunk in meditation." Here the Vaishnava poet asserts that the Absolute Divinity is incomprehensible even to those who are absorbed in meditation, but when He comes down on earth in human form as an avatara He can directly be seen by the devotees. The sight of the avataras is the sight of God. Sri Ramakrishnadeva thinks that avataras, "The god-men like Sri Krishna act and behave to all appearance as common men, while their heart and soul are absorbed in the highest in far beyond the region of Karma."

The author of the Bhagavata proclaims (I.3.26) that innumerable are the avataras of Hari who is the receptable of the sattva attribute and briefly mentions in that chapter the names of twenty-two of them including some of the famous conventional ten described later in the Gitagovinda of Jayadeva (c. 1200 A.D.). It may be noted that according to this Purana Narada, Nara-Narayana, Kapila, Dattatreya, Prithu, Dhanvantari, Vyasa and Buddha were regarded as avataras. But this work conveys the view that all other avataras are either amsas (parts) or kalas (glories) of the Highest Purusha, but Krishna is Bhagavan Himself. This idea reminds us of the famous verse of the Brahma-Samhita which states that "Govinda Krishna is the Highest Lord whose person consists of Sat (existence), Chit (intelligence) and Ananda (bliss or happiness), who is Himself without a beginning, (but) who is the beginning (of all), and who is the cause of all causes."

The conception of Avatara Krishna as the Highest Brahman is now being illustrated by reference to certain significant passages in the Bhagavata. After having related Brahma's words of praise (in chapter 14) addressed to the newly-born Krishna, the author of this Purana states through the mouth of Sukadeva who told King Parikshit about Krishna's full divinity in the following terms : "(O King !) you should recognize this Krishna to be the self of all selves, and He appears here (on earth) as if He has assumed a (human) body through the power of His own Maya for the welfare of the Universe. To those who have known Krishna in His reality in this world, all objects, movable and immovable, have the form of the Bhagavan Himself (Krishna) and they are nothing else. The real essence of all things pertains to a cause, and Bhagavan Krishna is the cause of that cause, so please observe (carefully) if anything is non-that (i.e. non-Krishna). To those who resort to the raft in the shape of the lotus-like (soft) feel of Murari

(Krishna) of holy fame which are the shelter of great men, the great ocean of (worldly) life seems to them as a calf's foot-mark, and the supreme place (Vaikuntha is their place), and the thing that is called adversity is not theirs." So we find that there is complete identity of Krishna with the Highest Being Bhagavan Himself.

In the Rajasuya sacrifice arranged by command of King Yudhisthira wherein were present many sages, kings, queens and prominent members of all the four castes, the assembly of these people could not decide as to who was the worthiest personage there, who deserved to receive the highest honour of worship, because there were innumerable great and worthy persons in it. It was then proposed (according to the Bhagavata in Book X.74) by Sahadeva, the youngest of the five Pandava brothers, who was fully aware of the omnipotence of Krishna, that the highest honour of reception should go to Krishna, and the arguments advanced by Him in the assembly were as follows "Bhagavan Achyuta (the imperishable or the permanent one, i.e. Krishna), the Lord of the Sattvatas, deserves to be regarded as the worthiest (person). He, really, stands for all deities and for (all) time, place, wealth and other (things). This Universe has Him for its self and all sacrifices also have Him for their souls. Fire, oblation, hymus, Sankhya (knowledge) and yoga (contemplative union)– all pertain to Him. He is only one and without a second. This Universe has its soul in Him. O members of the Assembly ! this un-born one (i. e. Krishna), having depended on Himself (alone), creates, maintains and destroys (everything) by Himself. All people long for bliss (or felicity) defined as dharma and other virtuous course from Him, after having performed various kinds of undertakings through His grace. Therefore, the chief honour should be bestowed on the the great Krishna. If that is done, honour will be regarded as being shown to all Beings and to the (Highest) Self. A person wishing for the highest eternal result of giving a gift should offer it (such a gift) to Krishna, the Peaceful, the Full, who does not reckon others as different from Himself and who is the (innermost) soul of all beings." In this memorable speech of Sahadeva, addressed to the members of the assembly in the Rajasuya sacrifice, the speaker asked the audience to believe that Krishna was no other than Brahman Himself who is declared as the Self of the Universe in some famous passages in the Chhandogya Upanishad. Verses 19 and 20 of Book X.74 of the Bhagavata which form a part of Sahadeva's speech remind us of the significant words of the Brihadaranyaka Upanishad.

On the eve of Krishna's departure for Dvaraka, Kunti expressed her

heart-felt gratitude to Him for protecting her family, her relatives and her sons, and in course of her address to Him in a prayerful eulogy (Bhagavata I.8.18-47) she recognized Him as God Incarnate. Out of that address, the substance of only a few sentences is here given in her own words !—"Krishna is the Primordial Purusha, higher than the Prakriti and the controller of that Prakriti. Although He is fully present in all Beings inwardly and outwardly, He is not realised as such. This is so because He Keeps Himself covered behind the veil of His own Maya." She felt Sorry that "it was not possible for a woman like herself to fully comprehend the greatness of Krishna who came down on earth to bestow Bhakti-yoga i.e. loving devotion (to God) on Paramahamsas and passionless Munis." She further thought that "a person who is favoured by His visit will have no more birth to suffer from." She salutes Him in the following manner : "Salutation be to Him whose only possession is the one (dovotee) who possesses nothing, and from whom all the three gunas (i.e. the three ends of life, viz. Dharma, Artha and Kama) have receded, who delights in his own self, who is tranquil, and who is the giver of Kaivalya (absolute liberation from bondage)." Here in Kunti's adoration of Krishna we can observe that she identifies Krishna with the Highest Bhagavan or Brahman without being able to fathom the so-called human activities of His.

Then again, after the Killing of Kamsa by Krishna, Uddhava who, being famous for his wisdom, acted as the chief minister of the Vrishnis and was an intimate friend of Krishna, was sent by the latter to Vraja with the message to His foster-parents. Nanda and Yasoda and His beloved Gopis that He would very shortly fulfil His promise of a visit to them at Vraja by leaving Mathura. Uddhava's address to the inmates of the Vraja contains passages from which we can ascertain his own views on the essential character of Krishna. Uddhava told them in the following way : "O you fortunate ones (i. e. Nanda and Yasoda) ! do not feel dejected, you will (soon) see Krishna near (you both). (Please know that) He resides in the inner heart at all beings (unnoticed), just as fire does in faggot (or wood). Unaffected by pride as He is, He has none as dear, or none hateful, none as high or low ; (and) being equal (to all) He has none as unequal. He has got none as his father or mother, wife or sons and others, or a relative, or a stranger ; (and) He has no body, or no birth. He has no work, good or bad (to do) in this world in His (apparent) manifold births. He appears only to perform a play end to protect the virtuous. Although He, the unborn, is without any attributes, yet in a playful mood, though being above any play, He adopts the three gunas the sattva (or harmony), the rajas (or activity) and

tamas (or inertia), and through them creates, preserves and destroys (everything).' It is also stated in Uddhava's address that "(Krishna) the Lord Hari, was not the son (fosterson) of Nanda and Yasoda but He was the son, the soul, the father, the mother and the master of all. Nobody could mention anything, seen or heard of, anything that was, is, or will be, either immovable or movable, great or small, which is certainly without Him, the imperishable, because He, being the Supreme Self (in it), is everything." Has not the Gita also described Him as the father of the Universe, the mother, the supporter and the grand father (too) ?

It has been hinted before that the Bhagavata is not only a bhaktigrantha (a treatise on loving devotion to God), but it also serves as an exposition of the vedantic ideas and views on the Absolute spirit, the Brahman. It is with such an idea in his mind that its author has most skilfully introduced the 87th chapter of book X named as Vedastuti (the eulogy of Bhagavan made by the personified Vedas). It was in answer to the most important theological question as to how the Nirguna Brahman could be explained as the Highest Reality by the Vedas which are Saguna (i.e. dealing with the limitations of attributes). We remember in this connection Krishna's advice to Arjuna to be above the three gunas or attributes which the Vedas deal with. To uphold his own views on Krishna's role in his treatise, the author of the Bhagavata makes the personified Vedas or Srutis wake up the Lord from his sleep at the end of Pralaya (dissolution) of the Universe by a stuti (prayerful eulogy) describing his nature and attributes as the highest Brahman. For the sake of illustration we shall take up only three verses from that eulogy in this article.

We find that in a verse in the eulogy the Vedas adore Lord Krishna with reverence thus : "O Lord ! there are a few (rare) persons who do not desire Apavarga (liberation), after having renounced home-life and having enjoyed the association of devotees acting in the manner of a flock of swans (i.e. bowing) before your lotus-like feet and after having shaken off (the fatigue of) their labour for plunging into the great ocean of nectar-like life-story of yours, (for), you have assumed (human) form in order to manifest the unfathomable nature of the soul or the supreme spirit." The Vedas here applaud Bhagavan Krishna in human form as the greatest object of worship by the devotees, a fortunate few amongst whom do not like even to attain Mukti (liberation of any variety), but desire to enjoy the eternal lila of the Lord. Bhakti to them is more valuable than mukti. The verse under discussion clearly implies that the Absolute Self assumes

human forms (such as those of Rama, Krishna, Buddha, Christ, Chaitanya, Ramakrishna Paramahamsa and other holy personages whom we call avataras) to teach their devotees the true nature of the Highest Self. But it appears that the crux of the whole teaching is that the devotees should live in a state of homelessness for adoring the lotus-like feet of their Deity. This verse also reminds us of the metrical passage in the Mundakopanishad which hints at the mercy of the Highest Self as the price of the devotion shown to Him by the devotees.

The same personified Vedas praise the Lord in the same context in another verse thus : "(O Lord !) there cannot take place any birth (of any Jiva or individual being) out of Prakriti or matter (alone), or Purusha or Spirit (alone), for, both of them are described (in scriptures) as Ajas (unborn), but like water-bubbles the life-bearing beings are produced out of a union of both (Prakriti and Purusha). Therefore these jivas with their various names and attributes enter into your great self (to be dissolved), just as the rivers lose their own identity by entering into the ocean, (or) just as the different juices (of several kinds of flowers) dissolve themselves into (a single kind of) honey." In explaining this verse Sridharasvamin states clearly that the births of jivas are not real, but only aupadhika i.e. conditioned, because they pertain to limitations of attributes of properties. In this one single verse the Bhagavata implicitly refers to a few important Upanishadic passages (as quoted in our foot-notes). It may be believed that the Absolute Self (Brahman) creates out of Himself the avataras (like Krishna and others) by his own power of illusion (Maya) to save human beings from the hands of the oppressors on earth.

The Vedas again praise Bhagavan as being totally one and Absolute Reality, hence the creation of the Universe is to be regarded as quite un-real. They adore Him thus : "(O Lord !) because this (Universe) did not exist in the past (before creation), and it will not exist in the future after dissolution, therefore, it is an established fact that in the intermediate or middle period it falsely appears to exist in you who are Absolute in essence. So it (the Universe) is compared with the different modifications of gold and other species. It is only the ignorant peresons who regard as real that which is only un-real and which is (only) a mental (delusive) production." Here in this verse also the Bhagavata declares in a way that Krishna is fully Absolute and His creation, preservation and destruction of the Universe are His playful activities, restored to by His power of Maya. To philosophers, specially the later Buddhist religious thinkers this verse

may have served as a suitable illustration for theory that the whole prapancha (Universe) is un-real or void or non-existent. They think that it is as delusive as a magic, a mirage, a dream, a moon in the waters or an echo. According to the Bhagavata the supreme spirit is an invariable and non-dual entity, wherein the Universe must be thought of in terms of the absence therein of all existences. It has been stated before that the Gita also declares (in iv.6) that Bhagavan creates Himself (as avatara) by his own power of Maya by resorting to Prakriti which is his own. According to Vedantic idea creation is nothing but Adhyasa or Superimposition i.e. attribution of properties of one thing to another. So it may prove the adage that Brahman is real and the Universe is false. In the present context we are reminded of some of the important passages in the Upanishads.

In conclusion it may be said that ordinary people may think that Sri Hari was born as man-Krishna and as the son of Vasudeva and Daivaki. The two religious treatises, the Bhagavata and the Gita, however, want to make Krishna's role as extraordinarily glorious and to teach us to believe by their description of avatara Krishna in different contexts as identified with the Highest Brahman. Both the treatises use for Krishna those attributes which are applied in the Upanishad to Brahman. The purpose of the writer of this article is only an attempt to attract the attention of his readers to this fact. It may be pointed out how beautiful the Bhagavata has stated that what is called as Brahman, as Paramatman or as Vagavan is the same one Daity and the monotheistic knowledge only leads us to the realisation of ultimtae Reality.